ম্যাজিক রিয়ালিজম : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে

নিলয় বক্সী

ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতার জন্ম হয়েছে সুদূর লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে। গতানুগতিক ইউরো-মার্কিন ঐতিহ্য বনাম বাস্তবমুখী সাহিত্যের বিকল্প প্রকরণ হিসেবে আধুনিকতার সেরা অভিজ্ঞান হল 'আশ্চর্য বাস্তব' বা 'জাদু বাস্তব' অথবা 'কুহক বাস্তব'—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Magic Realism. 'বিকল্প' শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বুঝে নিতে পারি লাতিন আমেরিকার যাবতীয় লেখালেখি এবং অবশ্যই তার গতানুগতিক প্রকরণ ভাঙার রহস্যকে। এই গতানুগতিকতা আসলে ইউরো-মার্কিন বাস্তবতা-নির্ভর কাহিনিগ্রন্থনের ধারা। সেই পরিচিত তথা চেনা ছকের বাইরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন একদল তরুণ সাহিত্যিক----অ্যালেহো কার্পেন্তিয়ার (কিউবা), গার্সিয়া মার্কেজ (কলম্বিয়া), মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তুরিয়াস (গুয়াতেমালা), হুয়ান রুলফো (মেক্সিকো), হুলিও কোর্তাসার (আর্জেন্তিনা), রোয়া বাস্তোস (প্যারাগুয়ে), ইসাবেল আইয়েন্দে (মহিলা ঔপন্যাসিক, চিলি)—প্রমুখ। কার্পেন্তিয়ারকে লাতিন আমেরিকান জাদু বাস্তবতার প্রবক্তা বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে এই ধারার সার্থক প্রকাশ ঘটে গার্সিয়া মার্কেজের বিখ্যাত রচনা—'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'-য় ('সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ')। ১৯৬৭ সালে মেক্সিকোয় বসে এটি লেখেন তিনি। ১৯৭০ সালে আর্জেন্তিনায় বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ সালে বইটির লেখক নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

পৃথিবীর আখ্যানসৃষ্টির ইতিহাসে 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' বইটি যথার্থই এক নতুন ধরনের রচনা। সূক্ষ্ম কারুকার্যে চোখ ধাঁধানো তার জেল্লা। মার্কেজ যখন জাদু বাস্তবের কথা লেখেন, তখন বাস্তবকেই আদতে তিনি আঁকেন। ভঙ্গিটাই শুধু নতুন। ধরনটা একেবারেই ক্ল্যাসিকাল নয়। পাঠকদেরকে তিনি দেন এমন এক কল্পিত আতসকাঁচ, যা বাস্তবকে ভালোভাবে দেখতে এবং বুঝতে সাহায্য করে। এই বইটির থেকে বুঝে নেওয়া যায়, লাতিন আমেরিকায় কোন ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে জাদু বাস্তবের জন্ম হয়েছিল।

১৯১৯-১৯২৩—এই সময়কালটা ছিল রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা এবং রাজনৈতিক হিংস্রতার সময়। কাইজার নিখোঁজ হয়েছেন। বাম ও দক্ষিণ পন্থী বিপ্লবী দলগুলো অনবরত যুদ্ধ করে চলেছে। হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক দলও এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। জার্মানিতে তখন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কারণ প্রথম

বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটেছে। চারদিকে ব্যাপক পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিপ্লবী কার্যকলাপে তৈরি হয়েছে জাতীয় সংকট, কোয়ালিশন সরকার তা প্রশমন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইওরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে জার্মানির অবস্থান বেশ খানিকটা দূরে। পুরোনো পৃথিবী ভাঙছে, বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। জনজাতির ভবিষ্যৎ জুড়ে শুধু অন্ধকার। বিভিন্ন দেশের মানুষ কোনওরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। এই পর্বে শিল্পীমহলও রীতিমতো শঙ্কিত এবং দ্বিধাগ্রস্থ। জীবনের সংশয় ও সংকটকে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁরা নতুন প্রকরণের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন, সনাতন ধ্রুপদী সাহিত্যের থেকে যে দর্শন ভিন্নমার্গের। বাস্তবের ভেতরে অন্য এক অদেখা বাস্তবকে, ভুবনকে তাঁরা খুঁজতে শুরু করেন। এসবের মধ্য দিয়ে ক্রমশ জন্ম নেয় জাদু বাস্তব।

অ্যাঞ্জেল ফ্লোরেস, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে Magic Realism কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি হোর্গে লুই বোর্হেসকে প্রথম ম্যাজিক রিয়ালিস্ট লেখক বলতে চান। তাঁর মতে, জাদু বাস্তববাদ আসলে স্পেনীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের রোমান্টিক-রিয়ালিস্ট ঐতিহ্যের পাশাপাশি, ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারানুসরণ। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, লাতিন আমেরিকান জাদু বাস্তবতা আসলে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রভাবিত, বোর্হেস এর যথার্থ উদাহরণ।[১] 'ক্লাসিক' সাহিত্যের বিপরীতে এর অবস্থান। এ কথা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'ক্লাসিক' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে ইউরোপের দাম্ভিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। ইউরোপের 'ক্লাসিকাল' যুগ বা গ্রেকো-রোমান যুগের নিরিখে তৈরি হয়েছে এইধরনের সাহিত্য। পরবর্তীকালে, উপনিবেশ পত্তনের হিংস্র কালপর্বে, প্রজা বা পরাধীন মানুষদের শাসকশক্তি শিখিয়েছে, 'ক্লাসিক' মানে নির্দিষ্ট কিছু বই যেগুলি ভালো, যাদের পরিকল্পনা মহৎ এবং সেগুলির মধ্যে রয়েছে ওজস্বিতা। এই ধরনের বইয়ের লেখক হবেন ইউরোপের বাসিন্দা। তাদের এই শেখানো বুলি কপচাতে থাকে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ, ভারতবর্ষও যার অন্তর্গত। ফলে, ইউরো-আচ্ছন্নতায় অন্ধ বিশ্বের মানুষের চোখের দৃষ্টি সারা দুনিয়ার লেখালেখির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে ভুলে গেল। ইউরোপের ধ্রুপদী শ্বেতকায় লেখকদের বন্দনায় মুখরিত হল তারা। অন্যান্য দেশ-মহাদেশ, বিশেষত ইউরোপের উপনিবেশিত স্বভূমি-পরভূমি, আমাদেরই মতো যারা ক্ষতবিক্ষত এবং দেউলিয়া—তাদের সাহিত্য বিষয়ে প্রবল অজ্ঞতায় আমরা দিন কাটালাম। এসব কিছুর বিরুদ্ধে প্রবল সহিত্যিক প্রতিবাদ এবং অনবদ্য বিস্ফোরণ—মার্কেজের 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'। জাদু বাস্তবের আচমকা থাপ্পড়ে আমাদের ইউরো-আচ্ছন্নতার নেশা দূর হল। বাস্তবকে আমরা আরো ভালো করে

দেখতে পেলাম। বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদী সাহিত্যের বিরল নজির গড়ে তুলল ম্যাজিক রিয়ালিজম।

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যেই যে শুধুমাত্র জাদু বাস্তব ছিল, তেমনটা কিন্তু নয়। ভারতবর্ষ, কানাডা, আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র—প্রভৃতি দেশের কথাসাহিত্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কুহক বাস্তবের নানান উপাদান। সালমন রাশদি, টনি মরিসন, আনা কাস্তিল্লো, মিলান কুন্দেরা, ভি.এম.থমাস—প্রমুখদের লেখায় জাদু বাস্তবের উপস্থিতি নানাভাবে লক্ষণীয়। দেশীয় সাহিত্যে,ইচ্ছাকৃতভাবে বাস্তবের মধ্যে স্থান এবং কালের পরম্পরাকে ভেঙে দিয়ে, কাহিনি ও চরিত্রের প্রয়োজনে—যাদু বাস্তবের টেকনিককে কাজে লাগিয়ে আধুনিক জীবনের বিপন্নতা আর অসহায়তাকে নানারূপে দেখানো হয়েছে। জাদু বাস্তবের এই প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্য আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁর লেখায় সবচাইতে বেশি অনুসৃত হয়েছিল, তিনিই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আফসার আহমেদ, কিন্নর রায়, দেবর্ষী সারগী, রমানাথ রায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস—প্রমুখদের লেখায়ও এই ধারার সার্থক প্রকাশ কমবেশি ঘটতে দেখা যায়।

দুই

ফ্রান্ৎস কাফ্কার 'দ্য মেটামরফোসিস' গল্পটি জাদু বাস্তবের অনবদ্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। গল্পের নায়ক গ্রেগর সামসা একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পায়, সে একটা দৈত্যাকার পোকা হয়ে গেছে। এইভাবে শুরু হয় 'দ্য মেটামরফোসিস'—যা একদা পাশ্চাত্য সাহিত্যে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ক্রমশ তার প্রভাব প্রাচ্য দেশগুলোতেও পৌঁছয়। এরই সূত্র ধরে মার্কেজের রচনায় ফিরে আসা যায়। কারণ, গল্পটি মার্কেজের মনেও গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। মার্কেজ সারাজীবনে মোট ৩৯টি গল্প লেখেন, যেগুলোর মধ্যে বাস্তব এবং অতিবাস্তবের টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। বাস্তবের মাটিতে পা রেখেই গল্পগুলো উড়ে যায় অতিপ্রাকৃতের জগতে। কাহিনিকথন কৌশলকে লেখক রপ্ত করেছিলেন তাঁর দিদিমার কাছ থেকে। শৈশবে মার্কেজকে তাঁর দিদিমা নির্বিকার মুখে আশ্চর্য এবং আজগুবি সব গল্প শোনাতেন। সেগুলি ছিল নানাবিধ অসম্ভাব্যতায় ভরা, অতিপ্রাকৃতের আবহে তৈরি। বাস্তবের যুক্তিজাল সেখানে পৌঁছত না। আলো-আঁধারি রহস্যের অনিশ্চয়তা ভরা অতিলৌকিক জগতে পাড়ি দিতেন শ্রোতা, দিদিমার মুখের ঐ গল্পগুলো শুনতে শুনতে। বৃদ্ধা বলে যেতেন অবলীলায়, স্বচ্ছন্দ গতিতে ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে। যেন বলার সময়, চোখের সামনে সে-সব কিছু অবিরাম ঘটতে দেখছেন। তাঁর গল্প বলার

এই নিরাবেগ ধরন এবং একের পর এক তৈরি করা ছবি, গল্পগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলত। মার্কেজ পরবর্তীকালে বলেছেন যে, মাতামহীর ঐ কথনভঙ্গিই তিনি ব্যবহার করেছেন 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসে।

মার্কেজের লেখায় বাস্তবের ছায়ার ভিতরেই ধরা পড়ে বাস্তবের মায়া মরীচিকা এবং কুহক। ধাঁধা লাগে চোখে। সমগ্র লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। সে-সব রচনার মধ্য থেকে জাদু বাস্তবের লক্ষণগুলোকে চিনে নেওয়া যায়। 'জাদু' কথাটির প্রকৃত অর্থ হল অ-সাধারণ সংঘটন, ভৌতিক কিংবা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতীত কোনও ঘটনা। অথচ, জাদু বাস্তববাদে—'জাদু' কথাটি জীবন-রহস্যকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ভূতের আবির্ভাব, জনগণের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অ-সাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভুত আবহ—সবকিছুই আনা হয় মূলত বাস্তবকে বোঝানোর জন্য। এই ধরনের রচনায় বাস্তব ফ্যান্টাসি এবং উদ্ভটের মিশ্রণ লক্ষিত হয়। একধরনের গোলকধাঁধার প্লট তৈরি করতে সচেষ্ট হন লেখক। তার সঙ্গে সমাজবাস্তবেরও সমন্বয় সাধিত হয়। স্বপ্ন, মিথ, পুরাণ, রূপকথা, লোককথা—সবকিছু মিলেমিশে থাকে জাদু বাস্তবে। সময়ের ক্রম বা ধারাবাহিকতা এখানে রক্ষিত হয় না। পাঠককে অবাক করানোর মতো অনেক উপাদান মজুত থাকে প্লটের ভাঁড়ারে। পরিস্থিতি কখনও হয়ে ওঠে আতঙ্কময়, উদ্বেগজনক—অথচ ব্যাখ্যাতীত। প্রাত্যহিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ফ্যান্টাসি, শিল্প ব্যতিরেকী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, অতিবাস্তব বা পরাবাস্তব, কিংবা অসম্ভাব্য ঘটনা অবলীলায় ঘটতে পারে জাদু বাস্তবে। তবে, একথা ঠিক যে জাদু বাস্তববাদী সাহিত্য কখনোই পরাবাস্তববাদী তথা ফ্যান্টাসিমুখ্য সাহিত্য নয়। এর প্রবণতা যেমন ভিন্ন, গোত্রও তেমনি আলাদা। এই ধরনের লেখা মাঝেমধ্যে আবার ঐতিহাসিক এবং নৈতিক প্রেক্ষণ থেকে অতীতের সঙ্গে সংঘাতেও নামে। অনেক সময় এর ক্যানভাসে ফুটে ওঠে এক কাল্পনিক নগর, কাল্পনিক সমাজ এবং সেখানে দেখানো হয় মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য তথা পরিণতি। জাদু বাস্তব কখনওই পরিপার্শ্বের বাস্তবকে অনুসরণ করে না, বরং তার আড়াল থেকে বেরোতে থাকা রহস্য এবং ধাঁধাকে ধরতে চায়। এই রচনায় মূল ঘটনার কেন্দ্রীয় কোনও কার্যকারণগত বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকে না। বিশ্বপ্রকৃতি অথবা মানবপ্রকৃতির মধ্যে লেখক সন্ধান করেন এক লুকোনো ক্ষমতা বা শক্তির। তাকে অবলম্বন করে প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে পৌঁছে যান পাঠক।

তিন

আধুনিক সাহিত্যে, প্রাচ্যদেশীয় জাদু বাস্তবের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই

আমাদের মনে পড়ে যায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুচরিত' বইটির কথা। উদ্ভট সরস গল্প পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয়। ত্রৈলোক্যনাথ যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সুগভীর সমাজবীক্ষণে মেতে উঠেছিলেন। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে, যাঁর লেখায় ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রয়োগ সব থেকে বেশি ঘটেছে---তিনি হলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। এই অর্থে শ্যামলকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রবক্তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠার সূত্রে শ্যামল একে একে দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, তে-ভাগা তেলেঙ্গানা বিপ্লব, উদ্বাস্তুস্রোত, বেকারসমস্যা, 'ঝুটা আজাদি'-র স্লোগান দিতে দিতে মিছিলে সামিল হওয়া ক্ষিপ্ত জনতা, চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ও বে-আইনি তকমা পাওয়া, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয়, নকশালবাড়ি আন্দোলন, কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্তি ও দাপট, জরুরী অবস্থা। অভিজ্ঞতার বৃত্তটি ক্রমশ পূর্ণ হয়েছে তাঁর। এইসব ঘটনা যদিও তাঁর লেখায় বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। তিনি লেখালেখি করেছেন মূলত চম্পাহাটির গ্রামে নিজের বাড়িতে এবং পরবর্তীকালে কলকাতা-২৬-এর প্রতাপাদিত্য রোডের ভাড়া বাসায়। বাস্তবের কাঠিন্য ও বীভৎসতাকে সামলেও তিনি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তবোর্ধ্ব জগতের চালচিত্র এবং অপ্রাকৃতের আবহ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা পড়তে পড়তে আমাদের মনে একটা সন্দেহ প্রায়শই দানা বাঁধে। যাকে আমরা বাস্তব বলে বিশ্বাস করেছি, আদৌ তা বাস্তব তো! নাকি তাতে কুহকের জাল বেছানো, পরা-বাস্তবের গুঁড়ো মাখানো! অলীক স্বপ্নের মায়াবী নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে তাঁর ব্যতিক্রমী ঘরানার কলমটি। বাস্তবের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে জাদু বাস্তব। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাস্তবের কায়াশরীরে ভিন্নতর এ অদেখা কোনো ছদ্ম-বাস্তবের নাড়িনক্ষত্র ফুটিয়ে তোলায় তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যের চলন মন্থর। আপাত ভাবের সঙ্গে নিহিতার্থের গভীর সম্বন্ধসূচক বাক্যগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। তাঁর বাচনরীতি (Diction) অংশত ভারি। দ্রুতপঠনে শ্যামলকে পড়ে ফুরিয়ে ফেলা বেশ কঠিন, রীতিমতো অসম্ভব। তার উপর, বাস্তব-পরাবাস্তব এবং কুহক বাস্তবের ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবীতে তিনি পাঠককে অনবরত দৌড় করান। শেষে অবশ্য সব সংশয় ও দ্বিধাকে সাম্যে এনে মিলিয়ে দেন। লেখা পড়তে পড়তে একটু অন্যমনস্ক হলেই শ্যামল দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন। লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে কখনও ধরা দিতে চান না। তাঁর

উদ্দেশ্যকে আড়াল করে থাকে বাক্যের স্বাভাবিক অন্বয়রীতির বিচ্যুতিক্রম, বাস্তব আর কুহক বাস্তবের দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষ এবং অবিরাম টানাপোড়েন। শ্যামলের মূলত তিনটি উপন্যাসে জাদু বাস্তবের সর্বাধিক প্রকাশ লক্ষিত হয়। সেগুলি হল যথাক্রমে—'অনিলের পুতুল', 'কুবেরের বিষয় আশয়' এবং 'হিম পড়ে গেল'।

চার

বইয়ের চেহারায় প্রকাশিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস হল 'অনিলের পুতুল' (প্রথম প্রকাশ—১৯৬৩)। কর্মসূত্রে লেখক তখন আনন্দবাজারে। কলকাতায় থাকেন। মাঝেমধ্যে জমি-বাড়ি দেখতে ট্রেনে বা বাসে চেপে এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়েন। যৌথসংসার, অসুখ, একাকিত্ব, অগ্রজের মৃত্যু, বাড়ির দমবন্ধ করা পরিবেশ—এইসময় তাঁকে অস্থির করে তোলে। 'আমার লেখা' শীর্ষক আত্মকথনমূলক প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন—*'মৃত্যু, দন্ত, শোক, অসুখ এবং ওষুধ—এরা পাশাপাশি বাস করে। তা দেখতে পেয়েছিলাম কোনও নিকটজনের দীর্ঘ হাসপাতালবাসের সময়। গবেষণার জন্যে মানুষ আলু-পটলের মতো কাটা পড়ছে শল্যচিকিৎসকের ছুরিতে। মৃত্যুর শত্রু একটি সাদা বাড়িতে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। বই লিখে ফেললাম।'* 'অনিলের পুতুল' হল সেই বই, লেখকের এই পর্বের অভিজ্ঞতার ফসল। উপন্যাসের নায়ক শ্রী অনিলকুমার রায়চৌধুরী নানান সাংসারিক এবং আর্থিক বিপর্যয়, তথা সার্বিক দুঃসময়ের মধ্যে দিন কাটালেও দেহের খিদে আর মনের নিঃসঙ্গতায় অনেক বেশি কাতর। মায়ের পাথুরিরোগের অস্ত্রোপচার সফল হয়নি। বউ পুতুলের লিভারের জ্বর-ব্যথার সঙ্গে দাঁত নিয়ে দুর্ভোগ। এর মধ্যে অনিলের বড়মাসির মৃত্যু হয়। মা'কে এই দুঃসংবাদ জানানো হয়নি। সমস্যা সবদিকে। অথচ, এইসব কোনোকিছুই অনিলকে সত্যি সত্যি বিচলিত করতে পারে না। তার উপর পুতুল দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা। তাদের প্রথমটি কন্যাসন্তান। অনিল রোগ-ব্যাধিকে ভয় পায়। এক ধরনের কল্পিত রোগের আক্রমণ সবসময় তাকে ভয় দেখায়। অথচ, আসল ভয়ের উৎস হল অনিলের অর্থাভাব। নিম্ন-মধ্যবিত্তের নিত্যদিনের অভাব-অনটন তাকে বড় বেশি কাতর করে। অধ্যাপক দাদামশাইয়ের সাফল্য সে পায়নি। তাঁর মতো নীতিবোধ বিসর্জন দিতে সে সক্ষম নয়। অনিলের পক্ষে তার মাসতুতো ভাই নৃপেনের সাফল্য যেমন অনায়ত্ত, তেমনি নৃপেনের ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস অর্জন করাও অসম্ভব।

আসলে মানুষকে নিয়েই শ্যামলের যাবতীয় কারবার। তার মধ্যে রূপের অনন্ত খনি বিস্ময়কর। অবিরাম অনুসন্ধানেও মানুষের রূপ-বৈচিত্র্য ফুরোবার নয়। শ্যামল তা জানেন। মানেনও। অনিল, কুবের, দেবকুমার, অনাথ—লেখকের সেই আমৃত্যু

অনুসন্ধানের সাহিত্যিক প্রতিমূর্তি। গল্প-উপন্যাসের 'প্লট' তো তাঁর কাছে রীতিমতো পায়ে হেঁটে চলে আসে। তিনি শুধু তাদের তুলে নেন। 'প্লট'-এর ভেতরে চোখ রেখে দেখতে পান অনেকদূর পর্যন্ত। জগৎ, জীবন এবং আশপাশের মানুষজনের কাছ থেকে লেখার বীজ পান তিনি। সে বীজ, নানান অভিজ্ঞতা কল্পনা ও স্বপ্নের আলোয় অঙ্কুরিত হয়। জীবনের মাটিতে পা রেখে কাহিনির চলন। ভাষা লেখকের কাছে মনের ভেতরকার অস্ফুট, অসম্পূর্ণ স্বগতোক্তির মতো। 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসেও লেখকের অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং স্বপ্নের নান্দনিক নির্যাস পরিলক্ষিত হয়। অনিলের সত্তার সংকট এ রচনার পাতায় পাতায় বর্ণিত হয়েছে। সেখান থেকেই তৈরি হয় সত্তার অন্যরকম অনুসন্ধান। আসে অস্তিত্বচিন্তা। এক মগ্ন অন্তর্মুখিনতার গহীনে ডুব দেয় নায়ক। বাস্তবের ধুলো-মাটি আখ্যানের শরীর থেকে ঝরে যায় শুকনো পাতার মতো। অবচেতনের অন্তরালে প্রভাব ফেলতে শুরু করে বাস্তবের কুহক। *'কিংবা রাত আড়াইটেয় দৌড়নো থামিয়ে পেছনের একখানা কামরা খুলে নিয়ে লাইনের পাশে সেটা মাথায় বালিশ করে চাকাগুলো আকাশের দিকে দিয়ে একটা ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন ঘুমোতে যাচ্ছে। নাকের ওপরের হেডলাইটটা জ্বালানো। ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার বোঝাই দশ বারোখানা কামরা খানিকটা উজিয়ে অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে অপেক্ষা করছে সেখানে। এমন সময় লাইনের পাশের জঙ্গলে ঘাস খেতে খেতে একটা মহিষ একেবারে বাইরে এসে হঠাৎ আলো জ্বালানো ইঞ্জিন, অন্ধকারে আকাশের দিকে উঁচু কর ঘুরন্ত চাকাগুলো দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এত বড়, এত অদ্ভুত।'* বোধবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের যুক্তিজালকে ছিন্ন করার খেলায় এইভাবে মেতে ওঠেন গ্রন্থকার। অনিলের মনোলোকে পৌঁছে যায় স্মৃতিবাহিত অদেখা এক জগতের সংবাদ। রাত্রিবেলায় মশারির মধ্যে ঢুকে ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুতে গিয়ে, তার দিকে চেয়ে অনিলের মনে হয়—*'মেয়েটা সাতশো পনেরো বছর খাটের ওই কোণে স্ক্রু দিয়ে আটকানো আছে, কাঁদলে কোলে নিতে হলে আগে স্ক্রু ড্রাইভার খুঁজে বের করতে হবে।'* শ্যামলের বর্ণনায় গভীরে এইভাবে লুকিয়ে থাকে অসম্ভাব্যতার অনেক ইশারা।

সারাদিনের ব্যস্ততার পরে, রাত্রিবেলা বিছানায় স্ত্রী'কে পেয়ে সম্ভোগের ইচ্ছা জাগে অনিলের। এমনি তো সারাদিন তারা দূরে দূরে থাকে। শোওয়ার ঘরটাকে মনে হয় যেন রেলের প্ল্যাটফর্মের মতো। কারণ—*'সবার সব সময় এ ঘর দিয়ে যেতে হয়। পর্দা দিলে কিংবা দরজা আটকালে মনে হয় চুরি করা মুরগি গোপনে কাটছে'।* সঙ্গমের সময় প্রয়োজন হয় গর্ভনিরোধক উপাদানের। রতিক্রিয়ার সময় অনিলের বিচিত্র রকমের উপলব্ধি হয়। *'এই সময়টা মনে হয় সুড়ঙ্গ পার হচ্ছে অনিল। এরপরেই একটা ব্রিজ, তারপরে খানিকটা জঙ্গল, কোণে টিকিটবাবুর কোয়ার্টারে শাড়ি*

শুকোচ্ছে—স্টেশন'। কোনও কোনওদিন স্ত্রী'র উপর হামলে পড়ে সে, ঝুঁকে পড়ে পাঁজাকোলে পুতুলকে তুলে নেয়। দুজনের গভীর ভালোবাসাবাসির উপমায় শ্যামল টেনে আনেন জঙ্গলের প্রসঙ্গ। *'তারপর জঙ্গল দিয়ে একেবারে ভিতরে চলে যায়। এসব কল্পনার কথা। ভালোবাসা হয়ে গেলে তারপর এইসব আরম্ভ হয়। কিছুদিন তো এইভাবে ভাবছে সে।'*

পারিবারিক অনটন, আপনজনের অসুস্থতা, সংসার জীবনের একঘেয়েমি—এসবকিছুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে অনিলের জীবন। *'ঘরের মধ্যে মশারির ঘর। এঘরে রোগা বৌ, পাতলা মেয়ে—ও ঘরে সেজো শুয়ে, অসুস্থ, তার বড় বোন তরঙ্গিনী ক'দিন হল নেই—সে খবরও সেজো জানে না। তবে সবচেয়ে ভালো যে ক'টা বাজে এখন তা বোঝার উপায় নেই।'* এরই মধ্যে ফুরিয়ে যায় এক একটা দিন। অপূর্ণ স্বপ্নগুলো আটকে থাকে বুকের খাঁজে। ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে অনিল। মানসিক ভারকে প্রশমিত করতে চায় স্ত্রী-সঙ্গমে। রাত আসে বিস্মৃতির প্রশান্তি নিয়ে। তাতেও রেহাই নেই। মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভাঙলে, কতো অলীক চিন্তা লাট্টুর মতো অনিলের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। *'ঘরের দেওয়াল, বস্তা কেটে কেটে বানান চটের সতরঞ্চির গন্ধ, পুতুলের পাশে শোয়ানো মেয়েটা, এরা সবাই অন্ধকারে ডুবে আছে। তবু অনিল তাদের দেখতে পেল। ইস্পাত দিয়ে তৈরি মশারির মতো ঘেরাটোপের মধ্যে পুতুলকে নিয়ে পড়ে আছে অনিল।'* এই ঘেরাটোপের বন্ধন থেকে তারা বুঝি কোনোদিনই মুক্তি পাবে না।

দ্বিধা-সংশয় আর কল্পনা মিলেমিশেই শ্যামলের সৃজন। কল্পনার সংস্পর্শ পেলে যে কোনও বস্তু শিল্প হয়ে উঠতে পারে বলে তাঁর ধারণা। তিনি বিশ্বাস করেন, শিল্পবোধের প্রধান কথা হল—জীবনে যা ঘটে তা শিল্প নয়। বরং, জীবনে যা ঘটলেও ঘটতে পারে—সেটাই শিল্প। যা ঘটতে পারে, অর্থাৎ ঘটনার সম্ভাবনাকে বারবার গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন তিনি। একে ইচ্ছেপূরণ বলাটা হয়তো সঙ্গত নয়। বরং, একে বলা চলে যাবতীয় পার্থিব অগোছালোপনার ভেতর লুকিয়ে থাকা অযত্ন-লালিত যত্ন, একধরনের শিল্পশোভন নিপুণতা যাকে যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করলে হিসেব মেলে না। তাঁর ধারণা, খোলা চোখে যতটা দেখা যায়, চোখ বুজলে তার চেয়েও বেশি দেখা সম্ভব। তখন বাস্তবের খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে আর একটি অদেখা, অচেনা বাস্তব। আশ্চর্য যার গড়ন। গোধূলির সীমান্তে চকিতে উদ্ভাসিত হয় আর এক পৃথিবী। জাদুর দুনিয়া।

'অনিলের পুতুল' উপন্যাসেও তার দেখা মেলে। দুপুরবেলায় অনিলের শোওয়ার ঘরে তৈরি হয় একধরনের অলৌকিক পরিবেশ। বাইরে আকাশ কালো করে জোরে

বৃষ্টি নামে। ঘরের ভিতরেও অন্ধকার। নিজের বিছানায় একাকী শুয়ে অনিল আচমকা দেখতে পায় বহুদিন আগে মৃত রাঙাদা-কে। তার সঙ্গে সাদা-রঙের একটা ময়ূর। *'অনিলের তখন আনন্দ মেশানো একটা অবিশ্বাস হচ্ছিল। এখনই জিজ্ঞাসা করবে রাঙাদাকে, এতদিন কোথায় ছিলে? গায়ের রঙ ফর্সা আছে।'* বাইরে প্রবল বৃষ্টি। তার—*'শব্দ ধুনুরির আওয়াজের চেয়েও একঘেয়ে।'* ঘরের ভেতরে ক্রমশ থাবা বসায় অন্ধকার। পরিবেশটা মোটেই গা-ছমছমে বা ভৌতিক নয়, তবে অ-লৌকিক। জাদু বাস্তব। দুই ভাইয়ের মধ্যে স্বাভাবিক কথাবার্তা হয়। শ্বেত ময়ূরটিকে একদিন পাহাড়ে ধরেছিল রাঙাদা। নাম খগেশ। তারপর পোষ মানায়। আজ বৃষ্টি বলে ময়ূরটি তার সঙ্গে বেরিয়েছে। আপাতত সে অনিলের ঘরে ঢোকেনি। বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজছে। বৃষ্টি তাদের প্রিয়। ঘরের অন্ধকারে বরং ময়ূরের হাঁপ ধরে যায়। নিজের এক সন্তান খগেশকে অসময়ে হারিয়ে অনিলের মা রীতিমতো পাগল হয়ে উঠেছিলেন। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে হঠাৎ হঠাৎ যে কোনও দিকে চলে যেতেন তিনি। এতদিন পরে রাঙাদাকে কাছে পেয়ে, সংসারের সব কথা অনর্গল বলে যায় অনিল। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে কতো গল্প করে। পথ-ঘাট চিনে তাদের বাড়ি আসতে রাঙাদা'র অবশ্য একটু অসুবিধাই হয়েছিল। *'অনিল কিছু জানতে চাইল না। কোত্থেকে হেঁটে আসতে হল—কিংবা পথঘাট কেন ভুলে গেলে—এসব কিছুই জানতে চাওয়ার সাহস নেই অনিলের। আজকে বিকেল থেকেই বৃষ্টি, এলোপাথাড়ি হাওয়া, অন্ধকার—সব, সব একসঙ্গে।'* কুহক আর মায়া জড়ানো অলৌকিক এই পরিবেশে একবারও পুতুল বা অন্য কাউকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখা যায় না। ঢুকলেই জাদুর প্রভাব কেটে যেত। এরই মধ্যে গাঢ় ঘুমে প্রায় অচৈতন্যের মতো হয়ে যায় খগেশ। *'অনিল টের পাচ্ছিল তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। রাঙাদা'র বড় বড় নিশ্বাস খালি খাটের ওপর আছড়ে পড়ছে।'* বাইরের পৃথিবীটা তখন অনেক দূরে। সংসারের অন্যান্য মানুষদের কেউই এই জাদু দুনিয়ার ধারে কাছে নেই। সেখান থেকে একটা শব্দ, কারোর গলার স্বর, এমনকি শিশুর কান্নার আওযাজ পর্যন্তও এখানে ভেসে আসে না। বৃষ্টির চরিত্রও রহস্যময়। অন্ধকার রাতে জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে গতজন্মের স্মৃতি মনে পড়ে যায় অনিলের। আশ্চর্য বাস্তবের সরণি বেয়ে, সুযোগ বুঝে পূর্বজন্মের ঠিকানায় এক লহমায় তাকে পৌঁছে দেন শ্যামল। এসব ব্যাপারে তো তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। *'বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির সামনের পথটা ভিজছে—মাঝরাতে এইটেই এখন অনিলের কাছে ভুত কিংবা ভয়। না হয়, ছাদের পাইপ থেকে একধারায় বৃষ্টি পড়ছে সামনের বাড়ির দেওয়ালটায়—এই দেখেই অনিল শুকিয়ে যায়। মুহূর্তে মনে হয় গত জন্মে এসব তার*

ছিল। মরে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। অনিল অজান্তে হঠাৎ সেই জন্মের একটা গলিতে ঢুকে পড়েই এসবের মুখোমুখি পড়ে গেছে। তাই দরজা দিয়ে বাইরে যা দেখা যাচ্ছে তাই-ই এত বিষণ্ণ, আগেকার চেনা, এখন মৃত—ভয় করে।'

পাঠকের অবাক হওয়ার মতো আরো একটি ঘটনা এরপর ঘটে। সেইসময় *'খগেশের পোষা কুকুরের মতো পাছাভারী ময়ূরটা থপ্‌থপ্‌ করতে করতে ঘরে'* এসে ঢোকে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অনিলের দিকে। তারপর আচমকা লাফ দিয়ে খাটে উঠে পড়ে এবং একপায়ে দাঁড়ায়। চারদিকে তখন বোটকা গন্ধ। ময়ূরটা তার লেজের ঝালর ঝুলিয়ে দেয় অনিলের মাথা, মুখ এবং বুকের ওপর। তারপর সে অনিলকে আক্রমণ করে, সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শরীরে। আক্রান্তের অবস্থা তখন রীতিমতো করুণ। *'অনেকক্ষণ ধরে বাইরের ঘরে একা একা এই রাতে যুদ্ধ করে অনিলের আর দম ছিল না। চেঁচাবে যে জিভটাও শুকিয়ে গিয়ে মুখের মধ্যে একটুও সরছে না অনেকক্ষণ। শুকনো ঘন্টার মতো আলজিবের খানিক আগে থেকে ঝুলে আছে। অনিল প্রাণের মায়ায় 'বাবারে' বলে ঠেলে উঠল।'* জাদু বাস্তবের পরিসর এই পর্যন্তই। তারপরে অনিলের ঘুম ভেঙে যায়। *'চোখ মেলেই দেখল কে তার সঙ্গে কথা বলছে।'* তার স্ত্রী পুতুল। নিচে হেরিকেনটা নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। *'ময়ূর নেই, খগেশও নেই। চোখে যেটুকু ঘুম ছিল ফলের খোসা তোলার মতো তা একদম উঠে গেল।'*

শ্যামল লক্ষ করেছিলেন, এ দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো অ্যাম্‌বিভার্ট মানুষজনে ছেয়ে গেছে। এদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে বিলাসিতা করার সময় কারোর নেই। আবার তাদেরকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বিরলে মগ্ন হয়ে থাকাও সম্ভব নয়। তাদের শরীরের কোষে কোষে রয়েছে পলায়নের পিপাসা অর্থাৎ মুক্তিবাসনা, যার বিশুদ্ধ নাম দেওয়া চলতে পারে চৈতন্যের ঘুমঘোর। অনিল এদেরই একজন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এদের কথাই লেখেন সহমর্মিতার সঙ্গে। অনিল-পুতুলদের কথা। মানুষকে দেখায় তাঁর নৈকট্য রয়েছে, দূরত্ব নেই। ফলে, চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। লেখকের এই দর্শনচেতনার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে প্রশংসিত হয় 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসের ভাষাও। অবিরল স্বচ্ছন্দ গতিতে, প্রায় প্রতিদিনের কথাবার্তার ধরনে তার সাবলীল চলন। অথচ, এরই মধ্যে মিছরির মতো দানা বাঁধে রহস্য, কুহক। লেখকের আভিপ্রায়িক অর্থ তখন অন্য একটা তল পেয়ে যায়।

পাঁচ

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের তৃতীয় উপন্যাস 'কুবেরের বিষয় আশয়'। ঐ একই বছরে মার্কেজ রচনা করেন 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'। কোনও এক

অলীক সূত্রে যেন জুড়ে যায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এই দুই রচয়িতার মনন। কলকাতা ছেড়ে বছর দুই আগে লেখক চলে গেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটিতে। জমি কিনে চাষ শুরু করেছেন, গরু পুষেছেন, পুকুর কেটে মাটি তুলে ইট বানিয়ে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন, চাষী ও ভূমিহীনদের সঙ্গে অন্যরকম জীবন যাপন করে চলেছেন প্রত্যহ। জমির বিলি-বন্দোবস্ত কিংবা খাল কাটার কাজও শুরু করেছেন। গ্রামজীবনের সঙ্গে এইভাবে ক্রমশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছেন তিনি। এই পর্বে জন্ম নিয়েছে 'কুবেরের বিষয় আশয়' নামক দীর্ঘ উপন্যাস।

মোটামুটিভাবে এর এক থেকে পনেরো অধ্যায়ের মধ্যে বিবৃত কাহিনিতে বলা হয়েছে কুবেরের মদনপুর যাত্রা, জনি কেনা এবং মদনপুরের পরিবর্তনের গল্প। পনেরো থেকে আঠাশ অধ্যায় পর্যন্ত দেখানো হয়েছে মৈসিনির চরে কুবেরের স্বপ্ন বিস্তার ও স্বপ্ন চুরমারের ইতিবৃত্ত। যদিও এই দুটি পর্বের মধ্যে আসা-যাওয়ার অবাধ ব্যাপারটা লেখক বজায় রেখেছেন। স্বপ্ন, স্বপ্নিলতা এবং জাদু বাস্তব—এই উপন্যাসেরও একটা প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। কুবের, অনাথ, অনিল, দেবকুমার বা নীলকান্ত—এরা প্রত্যেকে যে লেখক চরিত্রেরই প্রোজেকশন, তা তাঁর আত্মকথনের সঙ্গে মিশিয়ে পড়লে বেশ বোঝা যায়। *'ঘুরে ফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলী। তার মজা। তার আনন্দ। কল্পনায় তার গুলি চালানো কিম্বা স্বপ্নে তার ডানা মেলে ওড়া।'*[২]

শিল্পী যখন সৃজনে বিভোর, তখন তো তিনি একাকী। জীবনশিল্পী, স্বপ্নশিল্পী কুবেরও একসময় বোঝে—*'সে খুব একা পড়ে গেছে। এই পৃথিবীতে নিজেই সে এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে, যেখানে কোনো বন্ধু নেই, বন্ধু হয় না।'* গরু কিংবা কুকুর থেকে শুরু করে তার ছেলেমেয়ে—প্রত্যেকে তাকে ভালোবাসে। এই একাকিত্ব এবং ভালোবাসা দ্বন্দ্ব হয়ে আসে না জীবনে। এখানেই কুবেরের অভিনবত্ব। সে ঘোষণা করে—*'এখন আমি ড্রিম মারচেন্ট। এবেলা ওবেলা স্বপ্ন বিক্রি করি।'* বস্তু-পৃথিবীকে প্রাধান্য দিয়েও, তার পাশাপাশি বিমূর্ত পৃথিবী নির্মাণের অসামান্য ক্ষমতা শ্যামলের আছে। কুবেররা স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে ঐ বিমূর্ত পৃথিবীতে বসবাস করে। উপন্যাসের একুশ ও বাইশ নম্বর অধ্যায়ে আমরা এক আচ্ছন্ন কুবেরকে পাই। তার যাত্রা সুদূরাভিসারে। সে পথে স্ত্রী পুত্র প্রেমিকা অর্থ কাম আহার নিদ্রা ক্ষিদে—সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। সে—*'স্বপ্নে ভেসে আছে সব সময়—কোনোকিছুর ছায়া পড়ে না।'* এই অভিসারের পথে এগিয়ে যেতে যেতে কুবের একে একে হারিয়ে ফেলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণশক্তি, ভালো-মন্দ নিরাপত্তা কিংবা বিপজ্জনকতার অর্থ। কুবের তখন বিরাট এক সর্বনাশের নিরুপায় দর্শক। *'এই নিশুতি রাতে অচেনা*

দ্বীপের বুকে দাঁড়িয়ে কুবের বারবার বুঝতে পারছে—এই নদী, এই মাটি—বাতাসের দাপাদাপি, ভগবানের পোকামাকড়—সব কিছুর হাতে সে শুধুই একটা পুতুল। তার শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কোন রাস্তা নেই।'

উপন্যাসটি রচনার সময় আশ্চর্য বাস্তবের অনুভূতি লেখকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। একদিন নিশুতি রাতে বাড়ির পিছনদিকের বারান্দায় গিয়ে তিনি দাঁড়ান। আকাশের বুকে জ্বলতে থাকা চাঁদকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। চাঁদের শরীর নীল। অনেকটা যেন নীলচে মাখন মাখানো। চাঁদকে পৃথিবীর এত কাছাকাছি আসতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। *'কুয়াশার দলার ভেতর এইমাত্র নীলচে জ্যোৎস্না ঢুকে পড়ল। ধান কাটার পর বিশাল মাঠ। সারা চরাচর জুড়ে এক অখণ্ড, নীলচে আইসক্রিম। একটা যদি মই থাকত।'* ('একটি উপন্যাসের আয়ু')। ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। ঘুমের মধ্যে পেয়ে যান একটা মই। সেটা চাঁদের গায়ে লাগিয়ে ধাপে ধাপে উঠে যান। চাঁদের শরীরে হাত দেওয়ার পর অদ্ভুত উপলব্ধি হয় তাঁর। *'যা ভেবেছি, তাই। নীলচে মাখন মাখানো। হাত ডুবিয়ে দিলাম ভেতরে। কনুই অব্দি। ভেতরে চাঁদের বাড়ি। জমাট বাঁধা চুন-সুরকি। এবড়োখেবড়ো।'* ('একটি উপন্যাসের আয়ু')। চাঁদকে নিয়ে লেখকের ব্যস্ততায়—আকস্মিকভাবে ছেদ ঘটায় একটি সাপের দংশন। বিষ ছড়ায় সারা শরীরে। নীল চাঁদ তারপর তাঁর চোখে হয়ে যায় কালো পাথর। বিষঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তলিয়ে যাওয়ার আগে, তাঁর পোষা কুকুর বাঘা চিৎকার করে ডাকতে থাকে মনিবকে। *'অবচেতনের অতলে হারিয়ে আবার শেষ-মুহূর্তে বাঘার সেই ঘেউ ঘেউ পৃথিবী থেকে পাঠানো শেষ সিগন্যাল।'* ('একটি উপন্যাসের আয়ু')। পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর উপন্যাসটি লেখার সময়, এসব জিনিস প্রধান চরিত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন লেখক।

'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে মেদনমল্লের দুর্গের মধ্যে, অনেকগুলো অধ্যায় জুড়ে তৈরি হয় এক অপ্রাকৃতের আভাস। সেই অপ্রাকৃত মণ্ডলে ভেসে আসে দুধলি ফুলের গন্ধ, দিঘির নিশ্চল পরি, খরগোশের মতো নরম জীবের মাংস আগুন ঝলসাচ্ছে কামলারা আর ফাঁকে—*'গাঢ় লাল একখানা চাঁদ জায়গামত ঠেলে উঠছে। প্রায় গোল।'* চাঁদ আসে অপরিচয়ের বার্তা নিয়ে। এতদিন জানা ছিল, চাঁদ হলদে রঙের। এবার যে চাঁদ নেমে এল, তাকে প্রায় হাত দিয়ে ধরা যায়। তারপর দেখা গেল—*'দু ইঞ্চি পুরু করে নীল মাখনে চাঁদ মাখানো। আঙুল ছোঁয়ালে ডেবে যাবে।'* কুবের এই নিয়তি প্রেরিত চাঁদ দেখে চমকে গিয়েছিল একদিন, রীতিমতো ভয়ও পেয়েছিল। অপার্থিবতা চূড়ান্ত পরিমণ্ডলে পৌঁছল, বাইরে বেরিয়ে কুবের দেখল—*'ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নায় পরীগুলো যে কোন সময় উড়ে যেতে পারে।'* চাঁদ শনির মতই

ঝুলে থাকে তার কাছে। কুবের দেখতে পায়, এতদিনকার হলদে চাঁদে নীল মাখন মাখানো। সে চাইছিল দমকলের একটা মই, যা পেলে তরতর করে ঐ চাঁদের কাছে চলে যেতে পারবে। সে—*'আঙুল বসিয়ে দেখত চাঁদের গায়ে কতোটা পুরু করে মাখনের কোটিং।'* অবশেষে সেটা পেয়েও যায়। একটা মই। *'মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা রেখে কুবের চাঁদ পেয়ে গেল। মাথার ওপরে হাওয়ায় ঝুপসি ডালপাতাসুদ্ধ কাঁটাতোলা ডালগুলো নড়ছে। নীচে তাকালেই মাঠ ভর্তি ধান, আধখানা দিঘি জুড়ে জ্যোৎস্নায় পদ্ম ফুটে আছে—সারি দিয়ে দাঁড়ানো পরীদের যে কেউ এখুনি উড়ে যেতে পারে।'* খুব সাবধানে কুবের তার ডান হাতখানা চাঁদের ওপর চেপে ধরে। কনুই অব্দি গেঁথে যায়। নীল মাখনের কোটিং আর নীলচে আলো গলে গলে পড়ে চারদিকে। কুবের মইসুদ্ধ কাত হয়ে নিচে পড়ে যায়, টাল রাখতে পারে না। কারণ—*'চাঁদ বড় স্লিপারি।'* নায়কের আত্ম-আবিষ্কারের এই মহৎ আখ্যানের অসামান্য পরিবেশে পাঠক হিসেবে আমাদের মধ্যে যেন হঠাৎ এক বিস্ফোরণ ঘটে যায়। বর্ণনার ঘোরে তলিয়ে গিয়ে, আমরাও ঢুকে পড়ি জাদুর পৃথিবীতে। হাত দিয়ে ধরে ফেলি ঐ নীল মাখন মাখানো চাঁদকে।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, 'সুপার ন্যাচারাল সেটিং' তৈরি করতে গিয়ে লেখক, চাঁদের সঙ্গে সাপের 'মোটিফ'-কেও গোড়া থেকে হিসেব করেই ব্যবহার করেছেন। একসময় ছিল বাস্তু সাপ, যে কুবেরকে দেখে যেত। তারপরে নানাভাবে সাপ এসে কুবেরের আয়ুকাল লক্ষ করে গেছে। সাপের দৃষ্টি সীমানার বাইরে সে নয়। তিরিশ নং অধ্যায়ের শেষেও নীল মাখন মাখানো চাঁদের স্বরূপ আবিষ্কারের মুহূর্তে সাপ দেখা দিয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর এই মুখোমুখি হওয়ার এক বিরল কিন্তু অসমাপ্ত situation এখানে তৈরি করেছেন লেখক। ভীত কুবের যে মুহূর্তে ফিরতে চেয়েছিল জীবনে, সেই মুহূর্তে সাপটা সারা শরীরে জ্যোৎস্না মেখে নিয়ে, কুবেরের শরীরে বিষ ঢেলে ফিরে গেল নিজের গর্তে। যন্ত্রণা-কাতর কুবের তখন অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তথাপি, প্রকট হয়ে ওঠে চাঁদের হাতছানি। চাঁদ আরো নিচে নেমে আসে। আরো বড় লাগে। আকাশ জুড়ে বিরাট একটা থালা যেন। চাঁদের আলোয় কোনও জ্বালা নেই। তার আলো নীল এবং নরম। হলুদ নয়। অথচ হায়, *'এত বড় একটা আবিষ্কার চেঁচিয়েও বলা যাচ্ছে না।'* এই ধরনের বর্ণনা শ্যামলের সমসাময়িক, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কারোর লেখায় নেই। মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে না কখনও। প্রকৃত শিল্পীর কাছে মৃত্যুর চেয়েও বড় হল জীবনচেতনা। কুবেরের কাছে তাই আবিষ্কারটাই বড় হয়ে ওঠে। তার কাহিনি লিখতে গিয়ে শ্যামল সঙ্গত কারণেই বেছে নেন জাদু বাস্তবের পথ। গদ্যের মধ্যে কবিতার

সূক্ষ্ম কারুকাজকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি পাওয়া কঠিন। এই ধরনের কথনশৈলী আশ্চর্য বাস্তবের পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে আগাগোড়া সহযোগিতা করেছে। *'কিন্তু লেজের ঘষায় সারা তল্লাটের জ্যোৎস্না সোনালী আলোর গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে। কুবের আর চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। যেদিকে দেখে শুধু রাশি রাশি হলদে আলোর ধান। ইচ্ছে করলেই সেইসব আলোর গুঁড়ো দু'হাতের আঁজলায় ভরে তুলে নিয়ে খুশিমত ছড়িয়ে দেওয়া যায়—ছিটিয়ে পড়বার সময় তা নির্ঘাত ধান হয়ে ছিটকে পড়বে।'* এমন বর্ণনা অতুলনীয়।

ছয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'হিম পড়ে গেল' উপন্যাসটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। এই রচনায় জাদু বাস্তবের সর্বাধিক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। কাহিনির নায়ক দেবকুমার বসু মধ্যবয়স্ক চাকরিজীবী এক মধ্যবিত্ত। বেসরকারি অফিসে কাজ করেন, মাস গেলে মাইনে পান। বৌ শেফালীর সঙ্গে এতদিনের দাম্পত্য সম্পর্ক মোটেই খারাপ ছিল না। ইদানীং তাতে ফাটল দেখা দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী'র শরীরী সম্পর্ক শিকেয় উঠেছে। দুজনের বিছানা আলাদা। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আরও নিঃসঙ্গ হয়েছে এই দম্পতি। ছেলে রাজা বসু (রাজু) স্কুলে পড়ে। সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশুনায় তার মন নেই। দিনরাত শুধু দাবা খেলার নেশা, রাজা, মন্ত্রী, সান্ত্রী, গজ—এসব সাজায়, আর বুদ্ধি করে চাল দেয়। লেখক, দেবকুমারের ভাড়া বাড়িটিকে ঠাট্টা করে বলেছেন—'বসুজ ইটিং লজ'। যে যার মতো স্বাধীন। পাশাপাশি দু'টো ঘরে তিনজন 'বোর্ডার'। প্রথমজন স্বয়ং দেবকুমার, দ্বিতীয়জন তাঁর স্ত্রী শেফালী এবং তৃতীয়জন রাজু। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হতে না হতেই বাড়িটি হাসপাতালের চেহারা নেয়। একঘরে নীল মশারির তলায় ঘুমন্ত মা এবং তার ছেলে। অন্যঘরে দেবকুমার। ভূতুড়ে এক নিস্তব্ধতা সারা বাড়িকে তখন গ্রাস করে।

সবই চলছিল ঠিকঠাক। কিন্তু, চলল না শেষপর্যন্ত। প্রকৃতির বেখেয়ালে ঋতুপ্রবাহে ছন্দপতন ঘটল একবার। বর্ষা আসার আগেই হিম পড়ে অসময়ে। বর্ষা আসি আসি করেও এল না। *'...মাঠে ভোরবেলা নধর সবুজ বরবটিগুলো ভিজে যায়—মোটা পাতার ঘাসে আলো পড়লেই চিকমিক করে ওঠে।'* হিম পড়ে যাওয়া মানে হয়তো—*'একটা বড় জিনিস টপকে গেল পৃথিবী। তার এই সাতচল্লিশ বছরের বেশ অনেকখানি জীবনে দেবকুমার একাণ্ড আর কোনোদিন দেখে নি। পুরো একটা ঋতু মুছে গেল?'* এখান থেকেই দেবকুমারের জীবনে সংকটের সূত্রপাত। প্রকৃতির আকস্মিক পরিবর্তন তাঁকে হঠাৎ করে বুড়িয়ে দেয়, একরাতের মধ্যে। বয়সে ৪৭ হলেও,

হাবভাবে ও বাহ্যিক রূপে তাঁকে মনে হয় ৭৪ বছরের বৃদ্ধ। মাথার চুল প্রায় সাদা। শরীরের লোমেও পাক ধরতে শুরু করেছে। *'আসলে বৃষ্টি না আসতেই হিম পড়ে গিয়ে এই পাঁচ ছ'মাসে তার কি সব ওলোটপালোট হয়ে গেল।'* অবশেষে হিম পড়ে যাওয়ার সঙ্গে দেবকুমারের বর্তমান মানসিক অবস্থার সংকট এবং শারীরিক অবস্থার দুর্দশাকে কৌশলে জুড়ে দেন লেখক। এক সকালে হঠাৎ বুড়িয়ে যাওয়া বাবাকে দেখে চমকে ওঠে রাজু। ক্রমে সে এবং শেফালী আবিষ্কার করে যে, দেবকুমার হঠাৎ করে বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। তাদের সংসারে নেমে আসে দুর্যোগ। শেফালীর মাথায় অজস্র চিন্তা পাক খায়। তার স্বামীর শরীরে কোনও গুপ্ত রোগ বাসা বেঁধেছে নিশ্চই, অথবা হাড়ে ঘুণ ধরেছে। তাই, স্বাভাবিক গতির চাইতে অনেক দ্রুতগতিতে শরীরের বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। অথচ, কার্যকারিতা এবং জীবনীশক্তির প্রাচুর্যে দেবকুমার তো ৪৭। সমস্যা হল, দুই বয়সের ধর্মের মধ্যে তালমিল করতে পারেন না তিনি। *'গত বর্ষায় বর্ষা না হয়ে আমার যে কী সর্বনাশ হয়ে গেল। এ যে কি এক ভেতরে ভেতরে হাড়ে ঘুণ ধরা রোগ। না আছে ট্যাবলেট। না ক্যাপসুল। বডির কোনো এক জায়গায় অপারেশন করে যে আমার শরীর থেকে বুড়োটে মেরে যাওয়া টিউমারটা বের করে দেওয়া যাবে—তাও নয়। তাহলে এখন আমি কি করি?'*

নিজের অজান্তে ক্রমশ বাস্তব জগতের থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হযে শুরু করেন দেবকুমার। এর মধ্যে ঘন ঘন জাদু বাস্তবের ভূতুড়ে ও অলৌকিক তোলপাড় চলে উপন্যাসের আখ্যান জুড়ে, এমনকি দেবকুমারের মস্তিষ্কেও। ক্রমশ তাঁর মধ্যে ঘোরতর উন্মত্ততা তৈরি হয়। সংসার থেকে, এমনকি পাড়ার থেকেও 'পাগল' অপবাদ পেয়ে তিনি বিতাড়িত হন। *'কলকাতার এত কাছে আছি আমি—অথচ আমার বউ ছেলে সংসার থেকে আমি কতদূরে! আমাকে আমার জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিল।'* সবকিছুর সূত্রপাত গত বর্ষায়। *'তখন ছিটেফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। শহরের বাইরে সব্জিতে আগাম এসে হিম পড়ে গেল।'*

দেবকুমার বসু একজন কবি ও দার্শনিক। তবে, পেশাদারী কবি নন। কবিরা তো অনেক সময় পেশাদারীও হন। গত বর্ষার পর থেকে, শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি, দেবকুমারের মনোজগতেও অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। তুরীয়মার্গের কতো চিন্তা-ভাবনা ভিড় করে মনের আনাচে-কানাচে, অনতিবিলম্বে সেগুলো কবিতার রূপে পায়। গদ্যছন্দে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলো তখন কবিতার কোমল মেহগনি। বাহ্যিক কোনও ঘটনা তাঁর মনের মধ্যে দাগ কাটলেই, ভেতর থেকে অবিরাম লাইনের স্রোত উঠে আসে। ভাবের উদ্বেল প্রবাহ জীবনের দুকূল ভাসায়। বর্ণমালা আর কথায়, সুর এবং ছন্দের জাদুতে, পঙ্‌ক্তিগুলো তখন শ্রাবণের আকাশে ভাসমান

এক-একটি মেঘখণ্ড। তারা অস্থির, চঞ্চল। দেবকুমারের হাড়ে ঘুণ ধরলেও ধরতে পারে। তাঁর শরীরের কোষে কোষে প্রাচীন পৃথিবীর বয়স। মনে তবু নবীন সকাল। উজ্জ্বল সোনালি রোদের এক ভোরবেলা। দেবকুমারের কথাগুলো ক্রমশ কবিতার আকার পায়—

'পতন ও পত্তনে
ইতিহাস সমান হাসে
পরাজিত রক্তের নাম যেমতি পুঁজ।'

সত্তা তখন ভারহীন। মন ভেসে বেড়ায় অন্য এক পৃথিবীর অভিমুখে। যেখানে রয়েছেন তাঁর ছাত্রাবস্থার প্রিয় লেখক, খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক সুকুমার দে সরকার। দেব সাহিত্য কুটীর থেকে ১৯৪৪ সালের পুজোবার্ষিকীর পাতায় প্রকাশিত সুকুমারবাবুর গল্পটির কথা আজও মনে আছে দেবকুমারের। তাঁর মানসলোকে আছেন প্রিয় ডাক্তার এবং গুপ্তরোগ বিশেষজ্ঞ মি. কাবাসি। এঁদেরকে নিয়ে কুহক বাস্তবের মায়াবী পৃথিবীতে ঘন ঘন পা রাখেন দেবকুমার। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয় অহরহ। শেফালীকেও মনে হয় যেন দূরের মানুষ। মনের উপত্যকায় নেমে আসে ঘোর অবসাদ। চাকরি করতে যেতে তীব্র অনীহা তৈরি হয়। গেলেও, কাজে মন বসাতে পারেন না দেবকুমার। দরকারি ফাইলগুলো সামান্য নাড়াচাড়া করেই তুলে রাখেন জানলার শিকে। টপকালে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়বে তারা। দেবকুমারকে কেউ বোঝে না। ঘরে-বাইরে তিনি পরিহাসের পাত্র হয়ে ওঠেন। বেঁচে থাকেন কেবলমাত্র তাঁর স্বপ্ন আর জাদুর দুনিয়াকে ঘিরে। মনের ইচ্ছাগুলো মেটাতে সক্ষম হন না তিনি। *'সুকুমারবাবু ফিরে আসুন। মনে মনে এই কথাটি বলে দেবকুমার বুঝল, সুকুমার দে সরকার তো আর ফিরবেন না। তিনি তো অনেককাল হল উধাও, কোনো পত্র-পত্রিকায় আর তাঁর লেখা দেখতে পায় না দেবু। সেই অভিমানী আত্মঘাতী হরিণ—নেকড়ের গলায় মানুষ ডাকছে—এ আর হবে না।'* জাদু বাস্তবের লগ্ন ঘনিয়ে আসে ক্রমশ। বিছানায় শুতে না শুতেই দেবকুমারের দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে ঘুমের ঢল। শেষরাতে দেখা হয়ে যায় শিশু সাহিত্যিকের সাথে। আপনজনের মতো সুকুমারবাবুই তাঁকে ডেকে তোলেন। *'এক ভদ্রলোক এসে দেবকুমারকে ডাকল। উঠে এস দেবু।'* অতঃপর আগন্তুক তাঁর পরিচয় দেন—*'আমি তোমার সুকুমার দে সরকার।'* কুহক বাস্তবের বর্ণালী ছড়িয়ে পড়ে উপন্যাসের কথাশরীরে। পাঠককে তা বুঝে নিতে হয়। চলন্ত পাতাল রেলের সামনে আত্মঘাতী কোনও মানুষের সঙ্গে দেবুবাবু উপমিত করতে পারেন আত্মঘাতী হরিণটিকে। টাটা সেন্টারের চারপাশটা মুহূর্তের মধ্যে ঘন জঙ্গলে ঢেকে যায়। গাছের পাতায় জাফরানি রঙের সূর্য। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় ফেলে

আসা অতীতের সবকিছু। *'দিনের আলোটা দেব সাহিত্য কুটীরের পুজোবার্ষিকীর পাতার রঙের। একদম ঘিয়ে সাদা। রবীন্দ্রসদনের সামনে কাশফুল। পাতাল রেলের গর্তে বেগবতী নদী। ওপড়ানো মাটির পাহাড়ে সেই হরিণটি স্থির চোখে দাঁড়িয়ে। সুকুমার দে সরকার তারই দিকে ছুটে গেল।'* সময়ের হিসেব নিকেশ কেমন যেন গুলিয়ে ওঠে। ভাবনার অলৌকিক কোনো মন্ত্রে স্বচ্ছ নদী হয়ে ওঠে 'পুজোবার্ষিকীর পাতায় ঘিয়ে সাদা রঙের বাতাস।' মাঝেমধ্যে উঁকি দেয় কুয়াশা মাখা ভোর। *'পাতাল রেলের লোহার কড়িবরগা থেকে জল'* মেঝেতে পড়তে থাকে অনবরত। এরই মধ্যে আচমকা অভিমানী হরিণটা ঝাঁপ দেয় এবং শব্দ করে পড়তে থাকে পাতালে। তলিয়ে যাওয়ার আগে ঘুম ভাঙে দেবকুমারের। কুহকের জাল আপাতত ছিন্ন হয়। *'তখনও তার চোখে পুজোবার্ষিকীর পাতার ঘিয়ে সাদা রং। অথচ পৃথিবীতে তখন ফুটে উঠেছে ভাদ্রের মাঝামাঝি সকালবেলার পোড়া রোদ।'* প্রচ্ছদের রঙ ও রোদের রঙের চরিত্র কিন্তু আলাদা, যেমন ভিন্ন—ঐ দুই বাস্তবের দুটি তল।

রেহাই নেই দেবকুমারের। আচমকা একদিন সেলুনের আয়নায় আবার হাজির হল সরকারমশাই। *'কোনোরকম আভাসের তোয়াক্কা না রেখেই আস্ত সুকুমার দে সরকার, ফুটে উঠেছিল।'* নায়কের মনে তখন ঘোরতর আচ্ছন্নতা, স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব। দুজনের মধ্যে আলাপ জমে ওঠে বেশ। অলৌকিক কথাবার্তাও চলে। *'সত্যিই চলে যাচ্ছে জীবন। আমি টের পাচ্ছি সুকুমারবাবু।'* ট্যাকসির মিটারের মতো অনবরত ঘুরে চলেছে জীবনের কাঁটা। ফুরিয়ে যাচ্ছে আয়ু। খরচা হচ্ছে গভীর অবহেলায় এক একটা দিন। জীবনচক্রের এই অনিবার্য তত্ত্বকে নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছেন দেবকুমার। এমনকি, জন্মান্তরের রহস্যকেও। *'আসলে এই পৃথিবীর কোনো একটা মাঠে পথিকআত্মা একা একা নির্জনে কর্মফলের চাকাটা ঘোরায়—আপনমনে—শুধুই ঘোরায়।'* এসব অনুভূতির কথা দেবকুমার হয়তো ব্যক্ত করতে চান নিজেরই অন্য এক বিকল্প সত্তার কাছে। কুহক বাস্তবের অচেনা পরিবেশে সেই সত্তা সুকুমারবাবুর অবয়ব পায়। কখনো বা ডাক্তার কাবাসির। দুজনে একসঙ্গে পথ হাঁটেন, পিচের রাস্তার উপর দিয়ে। শৈশবের এক অমোঘ ভালোলাগার সাক্ষী হয়ে আছে তাঁর বইগুলো। তাইতো দেবকুমারের জীবনে সুকুমারের গভীর প্রয়োজনীয়তা। উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত তিনি খুঁজে গেছেন তাঁর এই প্রিয় লেখকটিকে।

জীবনটা যেন কল্প-বাস্তবে ঘেরা অমলিন দিঘির উপর পদ্মফুলের মতো ভেসে ওঠে। কী এক আশ্চর্য বাস্তবের ভূমিতে পা রেখে অনবরত হেঁটে চলেন রাজু-রুণুর বাবা, শেফালীর সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক স্বামী। তাঁর কবিসত্তার নেপথ্যে অলৌকিক কেউ ঘোরাফেরা করে। আকছার এমন হয়। অতিপ্রাকৃতের অনুভূতিও হতে পারে।

মনে হয়, দরজার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে এই প্রৌঢ়ের দিকে বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন। কবিতায় তারই আভাস—

'বাতাসে সে আসে ঘনঘন
ভাসে সে বাতাসে যখন তখন
দৃষ্টি বিঁধলেই সে শুধু বাতাস
নিরেট বাতাসে থাকে না কোনো জলছবি'

কবি পরিমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে একথা স্বীকার করেছেন দেবকুমার। কখনও পরিষ্কার টের পান, শরীরের জোড় কোথাও হয়তো খুলে গেছে—*'পার্টসগুলো কোনোরকমে একসঙ্গে আছে।'* একে অন্যের সঙ্গে তালমিল এবং বনিবনার বড্ড অভাব। *'—মুখের ভেতর অন্য এক জগতের গন্ধ। আতাগাছের পাতার গন্ধ। এই গন্ধ ধরেই একদিন রাতে আমি ঘুমের ভেতর একটা জঙ্গলে চলে যাই। সেখানে সেই চুনে হলুদ রঙের আত্মঘাতী হরিণটার ছায়া দেখতে পাই গোড়ায়। তারপর চোখ তুলে দেখি, খোদ হরিণটাই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঢিবিতে।'* ঘোরের মধ্যে অন্ধকার বারান্দা পেরোবার সময়, হরিণের দুটো চোখের মুখোমুখি হওয়ার পর, তিরতির করে কেঁপে ওঠে দেবুর শরীর।

কুহক বাস্তবের জালে আবারও বন্দী হন দেবকুমার। স্ত্রী এবং সন্তানের তাড়া খেয়ে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে, তিনি পড়েন কাবাসির খপ্পড়ে। এই গুপ্ত রোগের চিকিৎসক এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। রোগীর চিন্তাভাবনাকে তিনি আরও বেশি এলোমেলো করে দেন! যুক্তিও ভারি অদ্ভুত—*'মনে রাখবেন—এ দুনিয়ায় প্লাস ইকোয়ালটু মাইনাস!'* আজগুবি চরিত্রের এই ভদ্রলোকের পাশে, হরিণ-সমেত আবার এসে জোটেন সুকুমার। বাস্তবের পরিবেশ এবং পটভূমি—সবকিছু কীরকম যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। আশ্চর্য বাস্তবের অলীক কার্নিস দিয়ে হেঁটে চলে পাঠক। সঙ্গে নায়ক। *'দেবকুমার বসুর মাথার ভেতর একটা মাটির খুরি মটমট করে ভেঙে গেল। দেবকুমার পরিষ্কার দেখল, তপোবন প্যাটার্নের জায়গাটা তার বসার বেঞ্চসুদ্ধ একদিক উঁচু হয়ে গেল। যাকে বলে জল চলকান। তখনও তার আরাম লাগছিল। এই অবস্থাতেই ডক্টর কাবাসির গলা পেল। সাতচল্লিশ থেকে চুয়াত্তর—।'* কলকাতার রাস্তাগুলো হয়তো গিরগিটির মতো রঙ পাল্টায়। দেবুবাবুর বিশ্বাস। আজ যে জায়গাটার অস্তিত্ব আছে, কাল তা নাও থাকতে পারে। কাবাসির চেম্বার, সুকুমার, তপোবনসদৃশ চারপাশটা—এক লহমায় বেপাত্তা হয়ে যায়। তপোবনের আমগাছতলায় ধুনির মতো আগুনজ্বলা মুহূর্তগুলো, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, সঙ্গে চুনেহলুদ রঙের হরিণটিও। সেদিনকার

অভিজ্ঞতা ভারি পাথরের মতো দেবকুমারের বুকের উপর চেপে বসে থাকে। তারপর কতোদিন একা একা হাঁটতে হাঁটতে সঠিক জায়গায় পৌঁছে কাবাসির বাড়ির সন্ধান করেছেন তিনি। কিন্তু পাননি। কখনও মনে বিঁধেছে সন্দেহের কাঁটা—*'আমি কি সত্যিই কোনও ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম? হয়ত ভেবেছিলাম—যাব। আর যাওয়া হয়নি। তাহলে এই ডাক্তার—তার চেম্বার, গাড়ি—গাড়িতে করে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে অমন তপোবন—সবই কি আমার মাথা থেকে বেরল? না স্বপ্নে দেখেছি? তাই এখন সত্যি মনে হচ্ছে।'* এ হতে পারে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি—কিংবা দিব্যদৃষ্টি, অথবা পরাদৃষ্টি (Vision)। মনে হয় সেদিন সবকিছুই ঘটেছিল দেবকুমারের অবচেতনে। ফলে, বাস্তবে আর কখনো ঐ বাড়ির সন্ধান পাননি তিনি।

কাবাসির চেম্বারটা খুঁজে না পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন—*'পৃথিবীতে এই যে আলো দেখা যায়—এই আলোর চোকলা তুলে ফেলতে পারলে আরেকটা আলো আছে—'* ক্রমশ তা বেরিয়ে পড়তে পারে। অফিসে না গিয়ে ভূতপ্রস্থের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেন তিনি। কাবাসিকে খোঁজেন এবং সুকুমারকেও। একদিন তিনি মেডিকেল কলেজের পিছনদিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন, পুরোনো এক আমগাছের সন্ধানে। গাছটির সঙ্গে কাবাসি ও সুকুমারের যোগ প্রবল। হাসপাতালের দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠেও কোনও আমগাছ তাঁর নজরে পড়ে না। *'...অমন একটা আমগাছ—হরিণসমেত জায়গাটা মুছে গেল?'* এ যে রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অথচ, বাস্তবে অন্যকিছু ঘটে। একদল স্থানীয় মানুষ চোর সন্দেহে তাঁকে তাড়া করে। সম্বিৎ ফেরে আগন্তুকের। সাতচল্লিশ বছরের মানুষের মতো তীব্র বেগে দৌড়ে কোনওরকমে আত্মরক্ষা করেন তিনি। মেডিকেল কলেজের সদর থেকে জনতার তাড়া খাওয়ার পর পালিয়ে এসে, অবলীলায় দেবকুমার জাদু বাস্তবের অন্য এক পরিবেশে ঢুকে পড়েন। মেয়েদের চুল কাটার দোকানে। সেখানে কণা নাম্নী এক পূর্ব-পরিচিত নারীর মুখোমুখি হন দেবকুমার। হয়তো তাদের মধ্যে অতীতে কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। বিশেষত, কণার তরফ থেকে অনুরাগের প্রাবল্য তো ছিলই। কিন্তু, দেবকুমার ছিলেন ভীতু। ফলে, মেয়েটির ভালোবাসার আহ্বানে সেদিন তিনি সাড়া দিতে পারেননি। এতদিন পরে, কণা হয়তো তার প্রতিশোধ নেয়। কণার কাছে 'মেক-আপ' করতে করতে তিনি পুরোনো দিনের কথা তোলেন। আর, কণা তাঁর বয়স কমিয়ে, তাঁকে নতুন মানুষ করার চেষ্টা চালায়। অদ্ভুত কৌশলে 'মেক-আপ-রুমে'র মধ্যেও কুহক বাস্তবের মায়াবী পর্দা দুলে ওঠে। সেখান থেকে বেরিয়ে দেবুবাবুর নিজেকে মনে হয় সাঁইত্রিশ বছরের যুবক। তাঁর দৃঢ় ধারণা, মনের পাগলামোগুলো সব ঠিক হয়ে গেছে। *'আর কোনো গোলমাল নেই আমার। কণার*

সঙ্গে দেখা হতেই সব ঠিক হয়ে গেল। আশ্চর্য! কোথায় চুয়াত্তর—আর কোথায় সাঁইত্রিশ।' নায়কের সবকিছু আকস্মিকভাবে ঠিক হয়ে যাওয়া দেখে আমাদের সংশয় হয়, এ আবার নতুন করে কোনো মায়াবী মৌতাত কিংবা ছায়া-বাস্তবের সম্মোহন নয়তো! মনের সেই সংশয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত হয়। দেবকুমার অফিসে ঢোকার পর, তাঁকে দেখে সকল সহকর্মীর মধ্যে তৈরি হয় চাপা বিদ্রূপ, তির্যক ব্যঙ্গ আর অট্টহাসি। তিনি যেন অফিসের কর্মী নন, আস্ত একজন 'ক্লাউন'। কণার কারসাজি তিনি ধরতে পারেননি। এতদিন পরে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে সে তার ভূতপূর্ব প্রেমিকের দুটো ভ্রূ কামিয়ে, মুখে রঙ মাখিয়ে তাঁকে অফিসে পাঠিয়েছে, যাতে দেবকুমারকে আরো বেশি করে হেনস্থার মুখোমুখি হতে হয়।

মানুষের জীবনটাই তো আস্ত এক গোলোকধাঁধা, অন্তহীন 'প্যারাডক্স'। এই জীবন জুড়ে শুধু দুর্ভেদ্য রহস্য জাল বিছায়। জীবন আসলে কী—কেউই তা জানে না। এর অন্তর্লীন রহস্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে তাই বারে বারে জাদু বাস্তবের দ্বারস্থ হতে হয়। এ যেন, অলীক বাস্তবের ধাঁধা দিয়ে জীবনের রহস্যকে ফুটিয়ে তোলার কৌশল মাত্র। জীবন-রহস্যের অসঙ্গতি আর পারম্পর্যহীনতার কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমশ অন্যমনস্ক হয়ে যান দেবকুমার। স্মৃতিবিভ্রম ঘটে তাঁর। বাড়ি ফিরে বৌ-ছেলেকেও চিনতে পারেন না। *'জীবন মানে কিছু স্মৃতি আর সঙ্গ জোড়া দিলে যা হয় তাই।'* এর চাইতে সবকিছু ভুলে গেলে ভাল হতো। এক একসময় সেরকমটাই মনে হয় তাঁর। মানসিক সংকট এবং অন্তর্গূঢ় বিপন্নতা ক্রমশ তাঁকে দ্বিধার চূড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। শেফালীর কাছে স্বামীর অদ্ভুত আচরণের সবটাই অবশ্য পাগলের ভান। ক্রমশ তার সঙ্গে অসিতের শারীরিক এবং মানসিক ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। অসিতের বৌ ঋতুর বাড়ির ইস্কুলে চাকরি নেয় শেফালী, উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন ছাড়াও অসিতের সঙ্গ পাওয়া। এসব ব্যাপারে মৃদু আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, স্বামীর কোনো নিষেধকেই পাত্তা দেয়নি শেফালী।

ভূতগ্রস্থের মতো অন্য এক পৃথিবীতে চলে ফিরে বেড়ান দেবকুমার। বাস্তবের সঙ্গে তাঁর সংযোগটা ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে, অবশেষে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ছাতের কার্নিসে ওঠেন, দু'হাত তুলে আকাশের বুকে পাখির মতো উড়বেন বলে। আচমকা শেফালী এসে পড়ায় সমূহ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পায় ঐ দুটি প্রাণ। শেফালী আর সহ্য করতে পারে না, স্বামীর এই ধরনের পাগলামির দৌরাত্ম্য। মূলত তার ইন্ধনে এবং পাড়ার লোকজনের দাপটে ঘর ছাড়া, পাড়া ছাড়া—এক অর্থে পরিবারচ্যুত হতে হয় দেবকুমারকে। লেখক তাঁকে সম্পূর্ণ

মুক্তি দেন বাস্তব দুনিয়ার আকর্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে। এখন তো তিনি স্বাধীন, একাকী, উন্মাদ একজন কবি, দার্শনিক ও পরিব্রাজক। তাঁর জীবন জুড়ে শুধু ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম, মানুষজনের ভিড় অথবা ফাঁকা রাস্তা, নির্জন মাঠ, সবুজ গ্রাম, দরিদ্র দেবেন চাষীর আস্তানা, মাটি-কাদা-জল-জঙ্গল-গাছপালা ঘেরা মনোরম নিসর্গ। এরই মধ্যে আচমকা একদিন শালের জঙ্গলে ড. কাবাসির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর, অবচেতনের অন্তর্গূঢ় পথ বেয়ে।

'কোথায় সেই রাণী রাসমণির বাড়ির গায়ের গলিতে চেম্বার—আর কোথায় এই শাল জঙ্গল! কে জানে এ হয়ত ডাক্তারবাবুর আরেক ফক্কিকারি।' জাদু বাস্তবের আলাদা এক পরিবেশ। *'অনেকক্ষণ ধরেই হাঁটছিল দেবকুমার। দিগন্তের গাছপালার মাথায় অসময়ে সোনার রোদ বেরিয়ে পড়েছে। তার খালি মনে হচ্ছিল—ওইসব গাছপালার আড়ালে যে বসতি—তা তার খুবই চেনা। এখানে গেলেই সবাই তাকে চিনতে পারবে। কিন্তু কোন পথ দিয়ে যে ওখানে যাওয়া যায়---তার হদিশ করা কঠিন।'* কাবাসি, সুকুমার, হরিণ, অন্য এক পৃথিবীর মায়া, অচেনা দিগন্তে অপরিচিত সূর্যের আলো—সবকিছুই দেবকুমারের মস্তিষ্কের কোষে কোষে মাকড়সার মতো জাল বিছাতে থাকে।

দেবকুমারের তখন যাযাবর জীবন। বজবজ স্টেশন থেকে শুরু হয় তার অনিশ্চয়তার পথ পরিক্রমা, সেখান থেকে খড়গপুর প্ল্যাটফর্ম। আনাড়া স্টেশান। স্থানীয় ঢালু জমি পেরিয়ে চার্চ। চার্চের লাইব্রেরিতে বঙ্গীয় সাহিত্যকোষের সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জি (একাদশ খণ্ড) হাতে তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার দে সরকারের বিয়োগপঞ্জিটি তাঁর চোখে পড়ে। নতুন করে সুকুমারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন দেবকুমার। ক্রমশ হলদিয়া, মেচেদা, পুরুলিয়া। উদাস কবির দীর্ঘ এই ভ্রমণপথ ক্রমশ বোম্বাই এবং পুণে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। সুকুমারকে খুঁজতে খুঁজতে একরকমভাবে পৃথিবী ঘোরা হয়ে যায় দেবকুমারের। *'ভদ্রলোকদের বড় একটা পৃথিবী দেখা হয় না।'* তিনি তো এখন ঐ বৃত্তের বাইরের মানুষ। সময়ের ঘূর্ণনে অনবরত বদলে যায় স্থান-কাল-পরিবেশ। *'হরিণসুদ্ধ সুকুমার দে সরকারের আদলে মেডিক্যাল কলেজের খাতায়-কলমের আমগাছতলায় যে-লোকটিকে সে শেষ দেখেছিল—সে তো ডক্টর কাবাসির ডিরেকশনে চরস সেজে দিচ্ছিল। তারপর সব ভোঁ ভোঁ। একবার শুধু ডক্টর কাবাসি শাল জঙ্গলে টেবিল পেতে হেসে হেসে তাকে ডেকেছিল। ব্যস। আর কোনো চিহ্ন নেই।'* সুকুমার আসলে এক নস্ট্যালজিয়া, সকলের শৈশব-জীবনের প্রিয় লেখকসত্তার প্রতীকী রূপ। তাকে খোঁজা চলে, অথচ পাওয়া হয় না। জীবনের এই 'জার্নি' শেষ হয় না দেবকুমারের, অথচ একদিন তো ফুরিয়ে

যাবেই। তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো অন্য এক পৃথিবীর খবর এনে দেয়। নায়কের মস্তিষ্কের ভূতুড়ে অনুভূতির ঘোর পাঠককে ক্ষণে ক্ষণে টেনে নিয়ে যায় কুহক বাস্তবের অলৌকিক কারসাজির ভিতর।

সাত

বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের চেহারা রীতিমতো ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলন, চালের চোরা কারবার, ১৯৬৭ সাল থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের খেয়োখেয়ি, রাজ্য রাজনীতির টালমাটাল চেহারা, পুলিশের দাপাদাপি, দফায় দফায় রাষ্ট্রপতি শাসন, কংগ্রেসিদের মাস্তানি, মানুষের বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, নকশালবাড়ি আন্দোলন—এসবই তখন প্রাণবন্ত স্মৃতি। সেইসময় প্রকাশিত হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৭২)। প্রথম গল্পটি পড়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই, আশ্চর্য বাস্তবের মায়াবী পরিবেশে কোনও এক অদেখা জগৎ থেকে 'পরী'-কে নামতে দেখে।

'পরী' গল্পের মধ্যে প্রচারধর্মিতা, লেখকের আবেগের আতিশয্য, information বা বর্ণনার details—এসব কিছুই নেই, অথচ বাস্তবের কষ্ট এখানে পুরোদস্তুর রয়েছে। সমস্ত মানসিকতা লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন উত্তম পুরুষে। এ গল্পের মূল বিষয় হলো বেহালার বাজনা। চরিত্রদের ভেতরকার অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের জগৎকে নিপুণভাবে অঙ্কণ করেছেন শ্যামল। বাক্য সংস্থাপনের রীতি এখানে মৌখিক গদ্যের মতো। প্রায় আটপৌরে এবং নির্মোহ ভাষাভঙ্গির মাধ্যমে গল্পটি রচিত হয়েছে। অথচ এই আটপৌরে নিরাসক্তির মধ্যে থেকেও কোথাও হয়তো রোমান্স উঁকি মারে। চারপাশে জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত, এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় বেহালার বাজনা। সমস্ত পরিবেশটাই যেন তখন মধুময় হয়ে ওঠে। *'বিপিনবাবু পরী নামানোর জন্যে বেহালাটা খুব জোরে কাঁধে চেপে ধরেছে। আমাদের বাগানের বেলফুল গন্ধ ছড়াচ্ছিল বাতাসে। চাঁদ সারা পাড়া জুড়ে টর্চ ফেলেছে। এ-বাড়ি সে-বাড়ির রেডিওগুলো জুড়িয়ে এল।'* একধরনের প্রচ্ছন্ন সুখের অনুভব তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশ জুড়ে। বেহালার মধুর সংগীত এবং জ্যোৎস্নাময় পরিবেশ—এই দু'য়ে মিলে গল্পের আবহ তৈরি করেছে।

লোকটা চিট্, না ক্র্যাক্— তা কোনওদিনই বোঝা যাবে না। বেহালা বাজিয়ে পরি নামানো যতই আজগুবি হোক, মাটি গাছপালা খাল-বিল আকাশ-বাতাস যতই পাল্টে যাক, গৃহকর্তা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যতই বাস্তবপন্থী হোন, পরি কিন্তু নেমেছিল। শ্যামলবাবুর ছেলেপিলের মা, কতকাল আগে কিনে দেওয়া জড়িপাড় কালো শাড়িখানা

পরে, অনেকটা আগের দিনের নীলাম্বরী প্যাটার্নের সাজে সজ্জিত হয়ে বাগানে নেমে কলমের পেয়ারার ডাল ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে চাঁদের আলো ডালপালার আড়াল খুঁড়ে ভেতরে নেমে পড়তে পেরেছে। বারো-চোদ্দ বছরের পুরোনো বউকে বরণ করে বারান্দায় তুলে নিতে ইচ্ছে করে লেখকের, বুকের ভিতরে কতরকমের পাহাড়-পর্বত বেহালার ছড়ের একটানে গুঁড়িয়ে যায়। পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীরই কোনো পরি স্বপ্নসাধ হয়ে নেমে আসে। বেহালা বাজিয়ে পরি নামানো অসম্ভব ব্যাপার তো বটেই, রীতিমতো অবিশ্বাস্য ঘটনা। এইধরনের প্রস্তাবও হাস্যকর। মডিফায়েড রেশনে চাল-গম কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। পিচ্ রাস্তায় তিন গাড়ি গম লুঠ হয়ে গিয়েছে। বিয়ের বরযাত্রী থেকে স্টেশন মাস্টার, পোস্টঅফিসের বড়বাবু, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক—সকলেই চাল নিয়ে আলোচনা করে। স্মাগলারদের দাপটে প্রতিদিন ট্রেন 'লেট্' করছে। আধা-শহর আধা-গ্রামের প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে নানা অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায্য-অন্যায্য দাবি লেখা পোস্টার মারছে ছেলেরা। ট্রেনে বাজারে যতো পুলিশ বাড়ছে, ফ্রন্ট সরকারের ফতোয়া ততো লম্বা হচ্ছে। চালের দামও হু-হু করে বেড়ে চলেছে। এরকম এক প্রাকৃত পরিবেশে শ্যামল সত্যিই পরিকে নামালেন। নিজের ছেলেপিলের মা'-কে তিনি পরি হয়ে উঠতে দেখলেন। *'এত সুন্দর দেখাচ্ছিল। পারলে বরণ করে বারো-চোদ্দ বছরের পুরনো বউকে বারান্দায় তুলে নিতাম। কতকাল আলতা পরে না।'* তার গালে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়লেও সঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে, সে আদৌ পাউডার মেখেছে কিনা! এইভাবে মানবিক সম্পর্কের অনন্ত অনাহত অনুভবের যজ্ঞবেদী থেকে উঠে আসে চিরপ্রার্থিত প্রতিমা।

গল্পের মধ্যে একদিকে নিষ্ঠুর বাস্তবতা, অন্যদিকে তার থেকে বেরিয়ে আসার ত্রাণ—প্রবলভাবে ফুটে ওঠে। *'ছড়ের এক-এক টানে হাওয়াসুদ্ধ নদীর জল উঠে আসছিল এক-একবার। আবার ভাঁটাও হচ্ছিল। খালপাড়ের ওধারে দূর দিয়ে কলকাতার গাড়ি গেল আলো জ্বালিয়ে—লোকজন নিয়ে—আবার কয়েকগাড়ি লোক ফিরেও এল।'* গল্পের মূল সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে রয়েছে বৈপরিত্যের ঐ contrast-এর উপর। *'আলাপ রীতিমত জমে উঠেছে। এমন সময় বড়ো ছেলেটা এঁটো হাতে উঠে এসে আমার সামনেই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। ইশারায় থামতে বলে এগিয়ে গেলাম।'* বাস্তব এবং পরা-বাস্তবের মধ্যে কতোই না দূরত্ব! লেখক যেন এক মূর্তিমান বে-নিয়ম। নিজের সংসার সম্পর্কে তিনি আদৌ সচেতন নন। বিপিনবাবুর বেহালাই যেন গোটা পরিবারের মধ্যে সংগতের কাজ করেছে।

বিষম বাস্তবতার জগতে স্বপ্নময় কোনোকিছু ঘটতেও তো পারে। গল্পের শরীর থেকে ক্রমশ মুছে যায় reality. লেখক ও বিপিনবাবু—দুটি চরিত্রেরই বাস্তবের

থেকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বায়ন ঘটে। লেখকের স্ত্রী'র যে বিবরণ আমরা এখানে পাই, তাতে কিন্তু মানুষটাকে পুরোপুরি দেখা বা বোঝা যায় না। একধরনের না-দেখা ও না-বোঝা রহস্যময়তা যেন ঘিরে থাকে ঐ নারীকে। গল্পকার আমাদের ভাবিয়ে তোলেন একটি বিষয়, যে পরি আদৌ আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসবে, নাকি আমাদের চারপাশের জগৎ থেকেই উঠে আসবে পরি!

নিজের স্ত্রী'র দিকে তাকিয়ে লেখকের মনে যেন একধরনের অপার্থিবতার বোধ জাগে। Reality তাঁকে স্বপ্নের গভীরে মগ্নতার মধ্যে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যায়। পরি নামার প্রত্যাশা তিনি তৈরি করেন পাঠকের মধ্যে। গল্পের শেষ অংশে এসে আমরা দেখি যে, বিপিন সত্যিই জেনেছে—পরি নামেনি, বা পরিকে সে বেহালার বাজনার দ্বারা নামাতে পারেনি। কিন্তু লেখক তা ভাঙেন না। তৈরি হয় জাদু বাস্তবের পরিবেশ। *'দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম খানিক।'* ঐ মুহূর্তের বিভ্রমকেই তিনি সত্য করে ধরে রাখেন গল্পে, নিজের স্ত্রী'কে পরিরূপে দেখেন। পরিরা হয়তো মর্ত্যেই থাকে। দেখার চোখ থাকলে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। বিপিন পরি নামাতে না পারলেও, বেহালার বাজনার মাধ্যমে সুরের যে মূর্চ্ছনা সে তৈরি করেছে—তার একটা শাশ্বত মহিমা রয়েছে। 'পরী' গল্পটি absurdity থেকে শুরু হয়ে, রোমান্টিকতায় শেষ হয়েছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে স্বপ্নের ভূমিকা বড় কম নয়। মার্কেজ, বোরহেস, কার্পেন্তিয়ারের রচনায় যে Magic Realism, কুহকের সেই দুনিয়ায় শ্যামলের নায়কেরা পা রাখে মূলত স্বপ্নের কাঁধে ভর করে। তার পাশাপাশি অবস্থান করে জাগরণের মধ্যে পাওয়া সত্যগুলো। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে তিনি মিশিয়ে দেন চমৎকার প্রক্রিয়ায়। স্বপ্ন তখন আর নিছক স্বপ্ন থাকে না, হয়ে ওঠে বাস্তবের আর একটি তল—মায়াময় বাস্তব, স্বপ্ন এবং জাগরণ—এই দুই দেখা গুলিয়ে গিয়ে বোধের তৃতীয় স্তরে পৌঁছে যান লেখক। তৈরি হয় এক আলো-আঁধারি সত্য। শ্যামলের একাধিক গল্পে এই জিনিসটা এসে গেছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের হয়তো মনে পড়তে পারে আরো কয়েকটি গল্পের কথা। যেমন— 'উর্বরাশক্তি', 'গতজন্মের রাস্তা', 'সাক্ষী ডুমুর গাছ', 'নিশীথে সুকুমার', 'বোকা ডাক্তারের দুই রুগী', 'নিজেদের শ্মশান', 'পুরকায়েতের আনন্দ এবং বিষাদ', ' ঁলক্ষ্মণ মিস্ত্রীর জীবন ও সময়', 'রাখাল কড়াই'—গল্পগুলো।

মনের গভীরে পাওয়া সত্যগুলো কোথাও হয়তো বলাই হয়নি। স্মৃতি গলে বেরিয়ে গেছে তারা। কতোকিছুই তো মনে হয়েছে তাঁর। *'পৃথিবীতে একেক সময় মনে হয়—কোনো ঘড়ি নেই, দিক নেই, নাম নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। এ কোথায়*

এসে পড়লাম। আর কতদিন এখানে থাকতে হবে। যাবার সময়টা কেমন হবে কে জানে। আবার নিশুত রাতে ঝমঝম বৃষ্টির ভেতর মশারিতে আর কেউ নেই। সন্তানরা বড়ো হয়ে চলে গেছে। বৃষ্টির ধারায় পাশের পুকুরটাও মুছে গেছে। পুরনো ক্যালেন্ডারে বাদুলে পোকা বসলো থপ করে। বর্ষীয়সী স্ত্রী আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ফেরেননি। তখন বিছানায় শুকনো কাঁথা জড়িয়ে টের পাওয়ার চেষ্টা করি—বিশ-পঁচিশ বছর আগে সন্তানদের এ্যা করা ভিজে গন্ধ কাঁথায় আছে কিনা। ভাবতে ভাবতে সেই কাঁথা জড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। ভাবি আর যেন বেঁচে না উঠি। একদম মরে যাই। —এসব কথা তো লিখতে পারিনি।[৩] এসব কিছু নিয়েই তো পরিপূর্ণ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর যাবতীয় লেখালেখি।

'উর্বরাশক্তি' গল্পের একদিকে বাঘ কিংবা শেয়ালগোষ্ঠী, অন্যদিকে বাঁদরগোষ্ঠী। প্রথমটির প্রতিনিধিত্ব করে একটি মেয়ে বেড়াল—রাধারাণী, হুলো বেড়াল—প্রিয়গোপাল এবং তাদের ছানাপোনারা। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি—দুই পা, দুটো হাত এবং উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী তিনজন মানুষ—কল্যাণ, বিজয়া আর তাদের সন্তানসম্ভবা কন্যা। মানুষের আচরণ অবলীলায় এখানে overlap করে যায় বিড়ালের আচরণের উপর। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা কষ্ট—এইসব স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতিগুলো বেড়ালের উপরে আরোপ করা হয়। ফলে, তারাও মানুষের মতোই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, মানুষের ভাষায় কথাও বলে। চাঁদের আলোয় প্রিয়গোপাল-রাধারাণীর রতিলীলা এবং মিলন খেলা দেখে কল্যাণ। *'আবার সন্ধেবেলা জ্যোৎস্না এলে তাদের দু'জনের খেলা শুরু হয়।'* সঙ্গমের ফলে রাধারাণী দু'বার গর্ভবতী হয়। ওদের সঙ্গম দৃশ্য দেখতে দেখতে কল্যাণের সারাশরীর আমর্ম কামনায় কেঁপে ওঠে। নিঃসঙ্গ মানুষটি এখন আর স্ত্রী'র সঙ্গ পায় না। দম্পতির বিছানা আলাদা হয়ে গেছে। বহুদিন হলো, তাদের শরীরী সম্পর্কও ঝুলে গেছে। গল্পের শেষে *'বাঘ কিংবা শেয়ালগোষ্ঠীর দুই পশু ফোকাসের বাইরে বেরিয়ে'* আসে। পাশের ঘর থেকে *'বাঁদরগোষ্ঠীর কচি ছানাটি'* কাঁদে। কল্যাণ-বিজয়ার আদরের নাতি। এতকিছুর পরেও কল্যাণের *'শরীর দিয়ে এবার ঝুরি'* নামতে থাকে *'মাটি খুঁজতে।'* শারীরিক ও মানবিক ইচ্ছেগুলো মরে না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সাদা-সাপটা বাংলায় লেখা পছন্দ করেন। অথচ, তার ভেতর ভেতর অন্য এক ভাষাকে যেন কৌশলে বুনে দেন। জাদুগদ্যের জাদুভাষা। আর তাঁর সেই আপাত সহজ ভাষায় জাদুর টান বুলিয়ে পাঠকের মনকে তিনি অপূর্ব এক মোহিনীমায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন। 'পুরকায়েতের আনন্দ ও বিষাদ' গল্পে আমরা এর নমুনা পাই। নায়ক কমলেন্দুনারায়ণ পুরকায়স্থ *'বাঙালির একজন ঋদ্ধ সেতারি,'* প্রায় সকলেরই প্রিয়। জনগণ তাঁকে কমল পুরকায়েত নামে চেনে।

'শৈশবস্মৃতি, উদ্দাম যৌবন এবং থিতিয়ে আসা জীবন স্যান্ডউইচ করলে এখন যা দাঁড়ায়—তার নাম কমল পুরকায়স্থ।' তাঁর কাছে, মানুষের গুনগুনানো নানারকমের মানসিক অবস্থার নামই হলো রাগ-রাগিণী। নির্দিষ্ট চালের মাত্রা এবং তালের গতির উপর তাদের চলন নির্ভর করে। *'সাতটি তারে এইসব মন ধরে ফেলতে পারলে কমল পুরকায়েতের চোখে আস্ত আস্ত মানুষ উঠে আসে। তাদের গায়ের জামা। বাড়ির দেওয়াল। ভাতের থালা। ট্রামের মাস্থলি।' বিকেলে রাস্তার মোড়ে চেয়ে দেখতে পান—'সব রাস্তায় মানুষ নদী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে।'* তিনি জানতে চান, আনন্দের রঙটা কেমন, কিংবা তার ওজন! সারাদিনে চারবার ডাকবাক্স দেখেন, কারণ ডাকযোগে তাঁর কাছে কোনও চিঠি আসা মানেই খানিকটা আনন্দ-প্রাপ্তি। সেতারের ছড়ে টান দিয়ে সেই আনন্দকে খুঁজে পান তিনি। তৈরি হয় অনবদ্য এক কাব্যময় পরিবেশ। *'আশাবরী ঠাঁটে জৌনপুরী ধরার সময় কমল পুরকায়েতের আঙুলে মেজরাফ চেপে বসে যায়। সুর মেড়ে মেড়ে তোলার সময় তিনি পরিষ্কার দেখতে পান আলোর ভেতর, বাতাসের ভেতর আনন্দ চর্বি হয়ে থকথক করছে। তাতে জৌনপুরী পড়ে পিছলে যাচ্ছে। এই সময়টায়—কমল পুরকায়েতের বিশ্বাস—গাছে ফলের বোঁটা আসে, ইলিশে ডিম হয়।'* সেতারের সুর তাঁকে পৌঁছে দেয় আনন্দের অলকানন্দার কাছাকাছি কোনো তীরে, ভালোবাসার নন্দনকাননে। দীন পৃথিবীর মরচে ধরা বাস্তবের চাঁই সেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে অলীক বাতাসে উড়ন্ত জলকণার আকার নেয়।

'নিজেদের শ্মশান' গল্পের সেই কল্পলোকে বসে থাকা এবং শুকনো নেশা করা অসহায় কবি তুহিন বোসের কথা হয়তো আমরা কখনো ভুলব না। তুহিন আকাশ-কুসুম ভাবতে ভালোবাসত। *'ও একখানা চটি উপন্যাসই লিখে ফেলল, যাতে প্রতিষ্ঠিত অর্থবান সব চিত্রকর, কবি, ঔপন্যাসিক একটা দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে ঠিক করল—নৌকায় বেড়াতে বেরোবে। চল্লিশ পাতা জুড়ে সেই নৌকো তৈরি আর সাজানোর কথা। তাকে ঘিরে শিল্পীদের সে কি অর্থব্যয়। তেমন খরচা শুধু সৌখিন।'* বিজন দ্বীপের রাজা তুহিন। সেটাই ছিলো তার কল্পনার ঊর্ধ্বসীমা। বাংলা কবিতার এই 'মুকুটহীন রাজা' অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। বাড়ির এলাকার ভিতরেই তাদের পরিবারের *'প্রাইভেট শ্মশান।' 'একদম রিজার্ভ জায়গা।'* সেখানে দাহ করা হয় তুহিনকে। শবদাহ থেকে শোকসভা। তার সভাপতি হন, বিশিষ্ট একজন সাহিত্যিক এবং তুহিনের পূর্ব-পরিচিত—শরদিন্দু বিশ্বাস। শরদিন্দুর কাছে তুহিনের স্মৃতিবাহিত ঐ শ্মশান কল্পলোকের ভূ-স্বর্গ হয়ে থেকে যায়।

'গতজন্মের রাস্তা' গল্পেও জাদু বাস্তবের কিঞ্চিৎ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক। শশাঙ্কতিলক চৌধুরি শৈশবস্মৃতি রোমন্থন করে ডায়ারির পাতা ভরাট করেন। ছোটভাই নব-র যখন আড়াই বছর বয়স, তখন ভেতরের বারান্দায় বসে হাতের লেখা তিনি

অভ্যাস করতেন। সেই সময়কার বেশিরভাগ স্মৃতিই এখন পাতলা কুয়াশায় মাখানো, মনের গভীরে ডুব দিয়ে অনেক কষ্টে সেগুলো তুলে আনেন শশাঙ্কতিলক। টুকরো টুকরো ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। দুইভাইকে একথালায় ভাত মেখে মা খাইয়ে দিতেন। সবকিছু অনেককাল আগের কথা, বলতে গেলে 'গতজন্মে'-র যেন। *'তখন আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল না। মা ভূতের গল্প বলত খুব। বাতাসে হ্যারিকেনের শিখাটা থেঁতলে যেত। আর কিম্ভূত সব অন্ধকার এ-দেওয়াল থেকে লাফিয়ে ও-দেয়ালে পড়ত। তুই মায়ের কোল ঘেঁষড়ে আরো ভেতরে চলে যেতিস।'* নব-রও মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের কথা। *'...ওদের খাবার ঘরের ঠিক পেছনেই বাঁশবাগান ছিল—তার নিচে ডোবা। তাকাতে গিয়ে চোখ বুজে ফেলত। থোকা থোকা জোনাকি ছিটিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের পেছনে সেসব সময় রাত শুরু হত।'* গল্পটি পড়তে পড়তে আমরা ভয়ানক 'নস্ট্যালজিয়া'-য় আক্রান্ত হই। শশাঙ্কতিলকের স্মৃতির সরণি বেয়ে এগিয়ে যায় তাঁরই কল্পিত একটি রাস্তা। গভীর রাতে তিনি দেখতে পান, রাস্তার দুধারে বসানো গাছগুলোতে ফুল এসেছে। বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন রকমের ফুল। যেন ফুল-ফল আর পাখির মহোৎসব। শশাঙ্ক সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি। *'বকুল গাছে ফুল। ক্যাসিয়া গাছে হলুদ গুঁড়ো ফুল। নিম গাছে ফুল। নানা সুবাসে মেশানো রাস্তাটার গায়ের গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে হরেক পাখি বেরিয়ে আসছে—আবার তার ভেতরে মিশেও যাচ্ছে। লাল খোয়ার পথে ফুলগুলো ছড়ানো। তার ওপর দিয়ে বাঘা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফিরে আসছে। চোখের জায়গায় দু'টো নীল কাঁচের টুকরো বসানো। নিশুতি রাতে মালগাড়ির সান্টিংয়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। অমিতা অসাড়ে ঘুমোচ্ছে।'* জাদুগদ্যের সম্মোহনে এগোতে এগোতে পাঠক অবশেষে পৌঁছে যায় মায়াবী বাস্তবের অচেনা কোনো দিগন্তে।

'বোকা ডাক্তারের দুই রুগী'—খানিকটা ঈশপের গল্প, খানিকটা আবার সুকুমার রায়ের আমেজ লাগানো। সব মিলিয়ে এ হল শ্যামলের এক নিজস্ব নির্মাণ। 'নিশীথে সুকুমার' গল্পের সুকুমার রাতের অন্ধকারে লজ্জাশরম ত্যাগ করে বিবস্ত্র হয়ে ফ্ল্যাটের বারান্দায় নাচতে নাচতে শরীর ও মনের জীর্ণতা মালিন্য এবং অবসাদ দূর করতে প্রয়াসী হয়। *'এই নাচের ধর্ম। নাচ আমাদের ধর্ম এখন। এতে মিশে যেতে হয়। তাতে ভালোবাসা-বাসি হয়। পুরোনো ভালো ভালো দিন তাতে ভেসে চলে আসে। একদম তীরে। দাঁড়ালেই দেখা যায়।'* স্ত্রী বেলাকে সে কাছে ডেকে নেয়। বারান্দায় তখন অন্যরকম পরিবেশ। *'...আমি কত সুন্দর নাচতে পারি। বলতে বলতে সুকুমার প্রবাহিত স্রোতের প্রথম ঢেউটির ধারায় বাঁ পা-খানা এগিয়ে প্রায় ভেসে বেলার কাছে চলে এলো। তখন দু'খানা হাতের পাতা দুটি ছায়া-সত্রের মতো তার মাথা ও চিবুকের নিচে। সেই অবস্থায় পাকা কত্থক শিল্পীর স্টাইলে সে তার আস্ত মাথাটা বেলার মুখের কাছে নিয়ে একটু*

ঝাঁকিয়ে ফিরে এলো।' সুকুমারের ধর্ম এবার হয়তো নিতে পারবে বেলা। সুকুমারের মতো করে সুকুমারকে সে ভালোবাসতে পারবে। বাস্তবের চাপ ওদের ওপর থেকে তো কিছু সময়ের জন্য সরে গেছে।

আট

শ্যামল তাঁর প্রায় সব লেখাতেই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে ভেবেছেন। সে কেন জন্মায়, কীভাবে এবং কেন বাঁচে, তার ইন্দ্রিয় জুড়ে জেগে ওঠা লোভ-ভোগদখল-রূপমুগ্ধতা-কামনা-বাসনা—এসবকিছুর হেতু কী, সব কথাই তাঁর লেখায় বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। নারীর প্রকৃত স্বরূপ কেমন! জ্যোৎস্নায় অলীক মায়ায় ঘুরে বেড়ানো সাপ আসলে কী! তান্ত্রিকের কাছে বশীকরণ বিদ্যা শেখা সিদ্ধকামিনী আসেই বা কোথা থেকে! জীবন-রহস্যের এইসব নানান জিজ্ঞাসা, শিল্পের আলো-আঁধারি রহস্যের মধ্যে একে একে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন লেখক। রাগ-সংগীত, ইতিহাস-চেতনা, নিসর্গের অপার্থিব রূপ,পার্থিব স্বপ্নঘোর অথবা স্বপ্নভঙ্গ—সবকিছুই তিনি গ্রহণ করেছেন সমানভাবে, মনের স্বাভাবিক প্রসন্নতা বজায় রেখে। রহস্যময়ী রূপময়ী নারীর ভালোবাসা, তাকে রূপে এবং শরীরে দখলের আর্তি, দখলের পর অবসন্নতা ও যন্ত্রণা—বারে বারে বিদীর্ণ করেছে তাঁর মনকে। নিজেকে রক্তাক্ত গিনিপিগ করে অপেক্ষা করেছেন কোনও কাহিনিসূত্রের জন্য, বলা ভালো এক-একটি লেখার জন্য। প্রয়োজন কিংবা অপ্রয়োজনে ক্বচিৎ কুহক-বাস্তবের মোড়কে জড়িয়ে তাদের পরিবেশনও করেছেন তিনি সমান দক্ষতায়। তাঁর রচনায় ব্যক্তি কখনও সংসার থেকে দূরে চলে গিয়ে নিসর্গের কাছাকাছি বিজন-বাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে অবিরত খনন করতে করতে আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়েছে, কখনও আবার সময় ও ইতিহাসের স্রোতের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠান সমাজ রাষ্ট্র কিংবা পরিবারতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া সবকিছুর বিরোধিতা করেছে সে।

এইভাবে শ্যামল তাঁর লেখায় বাস্তবতার বিভ্রম ঘটান। কখনও বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়ে দেন কল্পনা, তৈরি করেন জাদু বাস্তবের আবহ। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে এমন এক গভীরতায় আমরা তলিয়ে যাই, যেখানে ধরা যায় না—কোনটা বাস্তব আর কোনটা মায়া। কখনও আবার কল্পনা, মায়া এবং বিভ্রম—মূল বাস্তবতারই এক একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এক নিরুপায় প্রাণকে নানাভাবে দেখে নেওয়ার প্রবণতা তাঁর সব লেখায়।

কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের কখনও তাই মনে হয়, দূর

নক্ষত্রলোকের কোনও এক বাসিন্দা, হয়তো বা সুপ্রাচীন কালের সিন্ধু-সভ্যতার কেউ। পুরুষপুর, গান্ধারে বসে তিনি যেন নির্মাণ করেছেন সভ্যতার এক-একটি মহৎ পর্ব। তাঁর বিভিন্ন লেখার ভিতরে যে আদিমতা—তাতে যেন তাঁকে ছায়ায় ঢেকে যাওয়া সেই পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা স্বপ্ন, কল্পনা আর অলীক বাস্তবের উপত্যকা দিয়ে সময় থেকে সময়ান্তরে হেঁটে বেড়ায়। আধুনিক কথাসাহিত্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একজন ব্যতিক্রমী ঘরানার লেখক হিসেবেই সকলের কাছে পরিচিত হয়ে থাকেন।।

টীকা ও উৎস নির্দেশ :

১. রবিন পাল। 'জাদু বাস্তবতা : বাস্তবতার ভিন্ন স্বর।' ''পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যভাবনা '' (সম্পাদনা : নবেন্দু সেন)। রত্নাবলী। কলকাতা। মে- ২০১৬। পৃঃ ২০৫।
২. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'আমার লেখা'। ''দেশ'' সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
৩. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ভূমিকা। 'গল্পসমগ্র-১।' দে'জ, কলকাতা। জানুয়ারী-১৯৯৪।

সহায়ক গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা :

১. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'রচনা সমগ্র-১'। দে'জ, কলকাতা। জুলাই-২০১১।
২. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'রচনা সমগ্র-২'। দে'জ, কলকাতা। জুলাই-২০১১।
৩. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'গল্পসমগ্র-১'। দে'জ, কলকাতা। জানুয়ারী-১৯৯৪।
৪. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। 'গল্পসমগ্র-২'। দে'জ, কলকাতা। এপ্রিল-১৯৯৪।
৫. নবেন্দু সেন (সম্পাদনা), 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা।' রত্নাবলী, কলকাতা। মে-২০১৬।
৬. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা)। 'বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস।' দে'জ, কলকাতা। জানুয়ারী-২০০২।

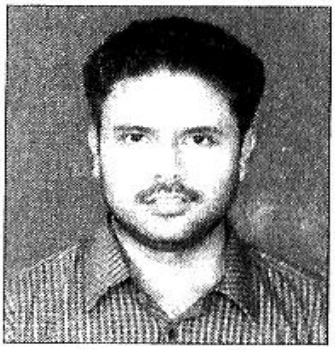

নিলয় বক্সী

২৩/১২/১৯৭৯ তারিখে উত্তর কলকাতায় জন্ম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে স্নাতকোত্তর স্তরের বাংলায় প্রথম শ্রেনিতে উত্তীর্ণ। ড. পিনাকেশচন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণা। শিরোনাম—'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথাকৃতি'। ২০১৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন। বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। পছন্দের বিষয়—আধুনিক কবিতা, কথাসাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি, সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা একটি।